হীরালাল ভকত কলেজ পত্রিকা

দিশারী

২০১৪—১৫ শিক্ষাবর্ষ

নলহাটি, বীরভূম

অধ্যক্ষ ড. নুরুল হুদা মহাশয়ের বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন স্বয়ং নুরুল হুদা।

দিশারী

অধ্যক্ষের অবসর গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মীগণ।

হীরালাল ভকত কলেজ পত্রিকা

দিশারী

পত্রিকা উপসমিতি

প্রধান উপদেষ্টা

অধ্যাপক দেবব্রত সাহা, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক

প্রধান সম্পাদক

ড. চৈতন্য বিশ্বাস, প্রধান, বাংলা বিভাগ
এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক প্রাতর্বিভাগ

সহযোগী সম্পাদক

ড. মণিশঙ্কর অধিকারী, বাংলা; অধ্যাপক গৌতম সেন,
ইংরাজি; অধ্যাপক শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জি, ইংরাজি,

সদস্যবৃন্দ

শ্রী ধনপতি মণ্ডল, প্রধান করণিক; শ্রী মলয় মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থাগার করণিক

।। বন্দেমাতরম্ ।। বন্দেমাতরম্ ।।

শিক্ষার প্রগতি ঃ সংঘবদ্ধ জীবন ঃ দেশপ্রেম

শিক্ষার সর্বস্তরে দুর্নীতি এবং শিক্ষবিরোধী
পরিবেশ দূর করতে ছাত্রছাত্রীরা
সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ হউন।

হীরালাল ভকত কলেজের বাৎসরিক পত্রিকা
দিশারীর সাফল্য কামনায়

তৃণমূল ছাত্র-পরিষদ
হীরালাল ভকত কলেজ, নলহাটি, বীরভূম

সভাপতি
নলহাটি শাখা

দিশারী

অধ্যক্ষ ড. নুরুল হুদার বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে পরিচালন সমিতির সভাপতি বিপ্লব কুমার ওঝাসহ কলেজের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মী বন্ধুগণ।

অধ্যক্ষ ড. নুরুল হুদাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন সভাপতি বিপ্লব কুমার ওঝা।

দিশারী

অধ্যক্ষ ড. নুরুল হুদার অবসর গ্রহণের পর অধ্যাপক দেবব্রত সাহাকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের পদে নিয়োগ পত্র দিচ্ছেন সভাপতি শ্রী বিপ্লব ওঝা।

সভাপতির প্রতিবেদন

হীরালাল ভকত কলেজের বার্ষিক পত্রিকা "দিশারী" প্রকাশ উপলক্ষ্যে আমার এই প্রতিবেদন-এর শুরুতেই কলেজের সকল অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকবৃন্দ ও শিক্ষানুরাগীদের জন্যই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

শিক্ষার লক্ষ্য শুধু পরীক্ষায় পাশ করা বা পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করা নয়। ছাত্রছাত্রীদের সম্পূর্ণ চারিত্রিক বিকাশ প্রয়োজন। প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকা হ'ল তেমনই এক আত্মপ্রকাশের জায়গা। তাই আমার স্নেহের ছাত্রছাত্রীদের লেখায় সমৃদ্ধ বার্ষিক "দিশারী'র প্রকাশ লগ্নে আমি গর্বিত।

মাত্র কয়েকমাস আগে এই মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসাবে আমার উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। এর জন্য আমি গর্বিত। ১৯৮৭ সালের ক্ষুদ্র শিশু মহাবিদ্যালয় যা স্থানীয় উৎসাহী শিক্ষানুরাগী মানুষজন ও প্রশাসনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা' আজকে তিল তিল ক'রে মহীরুহের দিকে এগিয়ে চলেছে। অনেক জ্ঞানী-গুণী শিক্ষানুরাগী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এই মহাবিদ্যালয়ের দায়িত্বে থেকে নিজেদের কর্তব্য পালন ক'রে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বড় ক'রে তুলেছেন। তাদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই। শুধু বাণিজ্য-বিভাগ দিয়ে শুরু হয়ে এই মহাবিদ্যালয়ে আজকে কলা ও বাণিজ্য বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ে অনার্সসহ পঠন পাঠন চলছে।

দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে লক্ষ্য করেছি, অত্যন্ত দক্ষ একজন অধ্যক্ষ কী সুন্দরভাবে ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সমন্বয় ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন। এই প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে বার বার সেই সদ্য অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. নুরুল হুদা মহাশয়ের কথা মনে পড়ে। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি তার শাসনের ভঙ্গি এবং পরবর্তীতে তাদেরকে আপন করে নেওয়ার কৌশল ড. হুদার সহজাত প্রতিভার ইঙ্গিত বহন করেছে। এই মহাবিদ্যালয় ড. নরুল হুদার অনুপস্থিতি প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করছে। ঈশ্বরের কাছে ড. হুদা মহাশয়ের অবসরজীবন সুন্দরভাবে কাটুক এই প্রার্থনা জানাই।

কলেজ পরিচালন সমিতি বর্তমানে একজন সুদক্ষ নবীন অধ্যাপক শ্রী দেবব্রত সাহার হাতে অধ্যক্ষ-র দায়িত্ব অর্পণ করেছে। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দায়িত্ব নিয়ে সংকল্প নিয়েছেন কিভাবে এই প্রতিষ্ঠানকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। তার এই প্রচেষ্টায় আমরা সকলেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি।

কলেজ সুষ্ঠভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতার একটা বড় ভূমিকা থাকে। আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাই, ছাত্রছাত্রীদের ছাত্রসংসদ-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারীগণ তা খুব সুন্দরভাবে পালন করে কলেজে শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশ সৃষ্টি করছে। ছাত্রসংসদ নতুন এবং পুরাতন ছাত্রছাত্রীদের সমন্বয় ঘটিয়ে বৎসরের বিভিন্ন সময় নানারকম সাংস্কৃতিক চেতনাকে বাড়িয়ে তুলেছে। N.C.C. এবং N.S.S.-এ অংশগ্রহণ করে ছাত্রছাত্রীরা সামাজিক অনেক জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে যুক্ত হতে পেরেছে। ছাত্রছাত্রীদের এই প্রয়াসে আমরা গর্বিত।

এই মহাবিদ্যালয় উন্নয়নের পথে প্রতি মুহূর্তে যে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের সহযোগিতা লাভ করেছে তিনি আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ প:ব: সরকারের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মাননীয় অধ্যাপক ড. আশীষ ব্যানার্জীর সক্রিয় সহযোগিতা ও পরামর্শের কথা স্মরণ করে। আমরা স্মরণ করি প্রাক্তন সভাপতি ড. জয়ন্ত চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই মহাবিদ্যালয়ের উন্নয়নে তার অবদানকে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে কলেজের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার লক্ষ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপকগণ আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আশা করি খুব শীঘ্রই আমাদের প্রয়াস সফল হবে। সাফল্যের সঙ্গে আমরা On-line ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করতে পেরেছি।

কলেজ পরিচালন সমিতির সকল সদস্যবৃন্দের সহযোগিতা আমরা সবসময় পেয়ে এসেছি। তাদের গঠনমূলক চিন্তাধারা আমাদের পাথেয়।

"দিশারী" পত্রিকা সম্পাদক ড. চৈতন্য বিশ্বাস মহাশয় অভিজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব। বিগত দিনে তার পত্রিকা প্রকাশনায় সাহিত্যে মুনশিয়ানা আমরা লক্ষ্য করেছি।

এই বৎসরের পত্রিকা "দিশারী" নিশ্চয় আরও উন্নতভাবে প্রকাশিত হবে, আশা করি।

পরিশেষে ছাত্রছাত্রীদের কাছে আবেদন, এই মহাবিদ্যালয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী বর্ত্তমান। তারা নিজেদের উজাড় করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, দায়িত্ব তোমাদের নিয়মিত ক্লাসে এসে শিক্ষার পরিবেশ আরও ভাল কর। তোমাদের ফলাফল আমাদের সকলকে গর্বিত করবে। সমাজের বিভিন্ন স্থানে তোমরা প্রতিষ্ঠিত হবে এই আশা করি।

হীরালাল ভকত মহাবিদ্যালয়ের সকল শিক্ষাবিদ, শিক্ষাকর্ম্মী, ছাত্রছাত্রীদের শুভ কামনা ক'রে এই মহাবিদ্যালয়ের সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

তাং-০১.১০.২০১৫
নলহাটী, বীরভূম

বিপ্লব কুমার ওঝা
সভাপতি
হীরালাল ভকত কলেজ
পরিচালন সমিতি,
নলহাটী, বীরভূম

কলেজের ছাত্র সংসদ আয়োজিত অধ্যক্ষ ড. নুরুল হুদার বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সভাপতি বিপ্লব কুমার ওঝা।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের প্রতিবেদন

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও যথাসময়ে আমাদের কলেজ পত্রিকা 'দিশারী' প্রকাশিত হ'তে চলেছে। তবে, এই রকম প্রতিবেদন রচনার জন্য অনুরুদ্ধ হ'লাম এই প্রথমবার। মাননীয় অধ্যক্ষ ড. নুরুল হুদা গত ৩০শে জুন অবসর গ্রহণের পর অন্যান্য অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের অনুরোধ ও সহযোগিতার আশ্বাসে আমি ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের দায়িত্ব গ্রহণ করি। সকলের সহযোগিতা ছাড়া এই দায়িত্ব একা বহন করা যায় না। এপর্যন্ত সেই সহযোগিতা আমি পেয়ে আসছি, তাই কলেজের কাজকর্মও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা চলাকালে আমি দায়িত্ব নিয়েছি। তার পর-পরই ঝুঁকি নিয়ে এবছর থেকে চালু করেছি অন লাইন অ্যাড-মিশন। প্রথম বছর, হ'লেও আমরা তেমন অসুবিধার মুখোমুখী হই নি। প্রথমবর্ষ, দ্বিতীয়বর্ষ, তৃতীয়বর্ষ—সকল শ্রেণীর ক্ষেত্রে অন লাইন ভর্তি চালু হয়েছে। প্রথম উদ্যোগে এটাতো স্বীকার করতেই হয়। আমার শিক্ষাকর্মী বন্ধুগণ ও অধ্যাপকেরা যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। বিশেষত, শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জির আন্তরিক চেষ্টা না থাকলে একাজ সুষ্ঠুভাবে হ'তেই পারত না।

এবছর পরীক্ষা নানা কারণে বিলম্বিত হওয়ায় নতুন শিক্ষাবর্ষের পাঠন-পাঠন শুরু হয়েছে পয়লা সেপ্টেম্বর। একই সঙ্গে শুরু হয়েছে কন্যাশ্রী, মাইনরিটি, সিডিউলড্ কাষ্ট, সিডিউলড্ ট্রাইব প্রভৃতি খাতে অনুদান পাওয়ার আবেদনপত্র জমা দেবার হাঙ্গামা। তাই, এই সময়টা পাঠন-পাঠনে একটু বিঘ্ন ঘটেছে। তবে এন.সি.সি. ও এন.এস.এস.-এর কাজকর্ম যথাযথভাবেই চলেছে। এদের সাহায্য নিয়ে, ছাত্র-সংসদের সমর্থনে এবছর নবীন বরণ উৎসবটাও আমাদের পরিচালনায় নতুনভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে।

আমাদের আর একটি কাজও দ্রুত সম্পন্ন করার ইচ্ছা রয়েছে। সেটা দ্বিতীয়বার কলেজের 'ন্যাক' করানো। ২০০৭ সালে প্রথমবার কলেজের NAAC হয়। ২০১৫ সালের মধ্যেই দ্বিতীয়বারের জন্য তা' করানোর উদ্যোগ চলছে। চলছে আরো অনেক কাজ; তার তালিকা দিয়ে প্রতিবেদন দীর্ঘতর করতে চাই না; কাজগুলো সুসম্পন্ন হ'লে, মানুষের দৃষ্টিগোচর হ'লে, তাদের সমর্থন ও স্বীকৃতি পেলে তবেই আমার স্বস্তি।

কলেজের পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে আমার অবদানও নেই, অভিজ্ঞতাও নেই। ওসব বাংলা বিভাগের প্রধান ড. চৈতন্য বিশ্বাস মহাশয়ের উপর ন্যস্ত ক'রে আমরা নিশ্চিন্ত থাকি। ছাত্র-ছাত্রী এবং অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের কাছ থেকে যেভাবে উনি লেখা আদায় করেছেন, তাতে ওঁর চেষ্টাও পরিশ্রমে পত্রিকাটি নিশ্চয় সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয়ে উঠবে। ড. বিশ্বাস বলছিলেন, অন্যান্যবারের তুলনায় এবার ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা খুবই কম জমা পড়েছে। লেখার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ কমে গেছে। তবু পত্রিকার মান যে বজায় থাকবে সে বিশ্বাস আমার আছে।

একটা প্রতিষ্ঠানিক পত্রিকা হ'ল সেই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র। প্রতিষ্ঠানের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের অনেকটাই ফুটে ওঠে এই পত্রিকার মধ্যে দিয়ে। তাই পত্রিকার মান উন্নত হ'লে কলেজেরই গৌরব। সেই গৌরব বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে অধ্যাপকেরাও এ পত্রিকায় তাঁদের মূল্যবান রচনা ছাপতে দিয়েছেন। তবু বলব, কলেজ পত্রিকা কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদেরই। তাঁদেরই আত্মপ্রকাশের, প্রতিভা বিকাশের প্লাট্‌ফরম। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস—যে কোনো বিষয়ে চিন্তা ভাবনার প্রথম প্রকাশ হ'তে পারে এই স্কুল-কলেজের পত্রিকাগুলোই। ছাত্র-ছাত্রীরা যদি সুযোগ না নেয়, তাহলে শিক্ষকদের আর কী করার থাকে। পাতা ভরাবার জন্য সম্পাদককে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের কাছেই হাত পাততে হয়।

স্কুল-কলেজে ভর্তি হওয়ার উদ্দেশ্য শুধু আর্থিক অনুদান পাওয়া ও পরীক্ষায় বসতে পারা নয়। যথার্থ শিক্ষা পাওয়া। আর শিক্ষাটা আর্থিক অনুদানের মতো নয়,

যে আবেদন করলেই পাওয়া যাবে। তার জন্য খাটতে হয়। প্রকৃত শিক্ষা নেবার ইচ্ছা থাকলেই দেওয়া যায় না, তা' নিতে হয়। নেবার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। কলেজে আসতে হয়, ক্লাসে বসতে হয়, শিক্ষকের পড়ানো বিষয় বুঝে নেবার চেষ্টা করতে হয়। কিন্তু একালের ছাত্র-ছাত্রীদের বৃহত্তর অংশ তাদের প্রাপ্য অর্থ ছাড়া কোনো কিছুই আগ্রহের সঙ্গে নিতে চায় না। এটা তাদের জন্য ক্ষতিকর, দেশের জন্যও। এ অবস্থার প্রতিকারের কথা আমাদের ভাবতেই হবে।

আমি ছাত্র-ছাত্রীদের পরামর্শ দেব, অযথা সময় নষ্ট না ক'রে তারা পড়াশোনায় মন দিক, পাশাপাশি সাহিত্য প্রভৃতিও পাঠ করুক, জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করার চেষ্টা করুক নিজেকে, জাতিকে, দেশকে সমৃদ্ধ করার সামর্থ্য লাভ করুক। তাদের জন্য আমার শুভেচ্ছা রইল। শুভেচ্ছা রইল আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সহশিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের জন্যও। শ্রদ্ধা জানাই পরিচালন সমিতির সদস্যগণসহ কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে। সবশেষে কামনা করি, সকলের শুভেচ্ছায় 'শিশারী' পত্রিকা সাফল্যমণ্ডিত হোক।

দেবব্রত সাহা
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ,
হীরালাল ভকত কলেজ

০১.১০.২০১৫

২০১৫-এর মিলাদ অনুষ্ঠানে সভাপতি শ্রী বিপ্লব কুমার ওঝা।

প্রধান সম্পাদকের কলম

প্রতিবছরের মতো ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবারও যথা সময়েই আমাদের কলেজ পত্রিকা 'দিশারী' প্রকাশ পাবে। এবারে পত্রিকার জন্য লেখা আহ্বান ক'রে বিজ্ঞপ্তি দেবার বেশ কিছুদিন পরও পর্যাপ্ত লেখা আমি পাই নি। অন্যবারে সব মিলিয়ে দু'শো—আড়াইশো লেখা জমা পড়ে; এবার সেখানে পঞ্চাশ জন ছাত্র-ছাত্রীও লেখার ব্যাপারে উৎসাহ দেখায় নি। এটা ভালো লক্ষণ কখনই নয়। লেখার ব্যাপারে, পড়ার ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের যদি এতটাই অনুৎসাহ দেখা দেয়, তাহলে সংস্কৃতি বজায় থাকবে কী উপায়ে!

মানুষ শিক্ষিত হ'লে তার নিজস্ব চিন্তা ভাবনার জন্ম হয়। লেখা পড়ার সঙ্গে যুক্ত হ'লে সেই চিন্তা-ভাবনার প্রসারতা ও গভীরতা বাড়তে থাকে। সেটা যত বাড়ে, মানুষ ততই সময়োপযোগী, প্রগতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে। স্কুল-কলেজের পত্রিকায় দু'একপাতা লিখতে পারলেই তাকে লেখক বা চিন্তাবিদ ব'লে বরণ ক'রে নেব না; অনেক লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ হ'লেও একজন মানুষকে যথার্থ কবি-সাহিত্যিক বলা যায় না, চিন্তাবিদ্, চিন্তানায়ক বলা যায় না। স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েদের তো নয়ই।

তাহলেও আমারা চাইব, যুগ পরিস্থিতি অনুযায়ী, সকল ছেলেমেয়েই সমকালের সমস্যাগুলি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করুক। সমস্যা সমাধানের পথ সন্ধান করুক। আর এর জন্যই লেখা এবং পড়া আবশ্যক। নিজের ভাবনার কথা অন্যকে জানাতে এবং অন্যের ভাবনার কথা জানতে এছাড়া আর কোনো মাধ্যম তো নেই। তাছাড়া, সামাজিক মানুষের সুখ শান্তির অনুকূলে চিন্তা-ভাবনাই মানুষকে 'মানুষ' ক'রে তোলে। আমরা তো সেই উদ্দেশ্যেই ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজে ভর্তি করি; লেখাপড়া শেখাতে চাই!

আজকাল স্কুল-কলেজের অধিকাংশ ছেলে-মেয়ের মতিগতি দেখে মনে হয়, তারা তাদের উদ্দেশ্যটাই ভুলে গেছে। জ্ঞান আহরণ করতে বা কিছু জানতে, শিখতে তারা যেন আসে না। আসে ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের নামের তালিকায় নিজের নাম নথিভুক্ত করতে। আসে লেখাপড়ার জন্য সরকারের বিভিন্ন প্রকার অনুদান বা সাহায্য আদায় করতে। তাই অনুদানগুলির জন্য যখন আবেদন গ্রহণ করা হয়, তখন কলেজের অফিসের সামনে ছাত্র-ছাত্রীর ভিড় উপচে পড়ে; ভিড় সামলানো যায় না। অথচ, পড়াশোনার ক্লাসগুলোতে কোনোদিন ভিড় বাড়ায় না। বিভিন্ন অনুদানের জন্য কবে ফর্ম্ জমা নেওয়া হবে, কোথায় জমা নেওয়া হবে, কীভাবে দরখাস্ত করতে হবে, কবে টাকা পাওয়া যাবে—এইসব বিষয়ে জানতে ছাত্র-ছাত্রীদের যত আগ্রহ, যত তৎপরতা, যত ব্যাকুলতা, তার সিকিভাগও যদি পড়াশোনার ব্যাপারে থাকত! দুঃখের সঙ্গেই জানাতে হয়, দশ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীও আজ লেখাপড়া শেখার মন নিয়ে স্কুল-কলেজে আসে না। তাই অনুদানের জন্য আবেদন বা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করা হয়ে গেলেই তাদের আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। তখন কলেজগুলো খা-খা করে! ক্লাসঘর গুলোয় হাতে গোনা দু'চারটে ছেলেমেয়ে ব'সে থাকে। শিক্ষকেরা ক্লাসে গিয়ে ফিরে আসেন, ছাত্র নেই বলে!

ক্লাসে ছাত্র না থাকুক, পরীক্ষার জন্য আবেদন করবার সময় আবার কিন্তু ভিড় হয়। পরীক্ষাও দেয়, পাশ করতে পারবে না জেনেও অনেকে পরীক্ষায় বসে। না বসলে পরের বছরের অনুদান পাওয়ার সুযোগ থেকে যদি বঞ্চিত হ'তে হয়! এমন পরীক্ষার্থীরা যে কেমন পরীক্ষা দেয়, তা' না বলাই ভালো। এদের যেমন বিদ্যা-বুদ্ধি, তেমন চিন্তা ভাবনা, তেমনি পড়াশোনা। এদের কাছে পত্রিকার জন্য লেখা চাইলে এরা অবাকই হবে। কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ—এসব লিখবার কথা তারা কখনো ভাবে না; চেষ্টাও করে না।

[illegible] কিন্তু ছাত্র ছাত্রী [illegible]

লেখা লিখিতে চেষ্টা করি পত্রিকাটিকে প্রকাশযোগ্য করে তুলতে। ছাত্র ছাত্রী 'ক্ষ' হাতে নিয়ে নিজেদের ও সহপাঠীদের লেখার তোর শোনাতে শোনাতে যা নিজেরা লেখা লাভ করাতে পারে। সকল শিক্ষক [illegible] জানিয়ে বিশেষত, ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা ভালই থাকুক,—এই আকাঙ্ক্ষায় আশীর্বাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি।

চৈতন্য বিশ্বাস
সম্পাদক, দিশারী
হীরালাল ভকত কলেজ
নলহাটি

[illegible]

বাংলা বিভাগের প্রধান, প্রাতর্বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. চৈতন্য বিশ্বাসের সঙ্গে ছাত্র সংসদের কয়েকজন।

হীরালাল ভকত কলেজ, নলহাটি, বীরভূম

পরিচালন সমিতি

শ্রী বিপ্লব ওঝা	: সভাপতি, পরিচালন সমিতি
অধ্যাপক দেবব্রত সাহা	: ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং সম্পাদক, পরিচালন সমিতি
অধ্যাপক অমিয় কুমার দত্ত	: সরকারের প্রতিনিধি
অধ্যাপক অসীম কুমার পাল	: বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি, রামপুরহাট কলেজ
অধ্যাপক উত্তম মণ্ডল	: বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি, অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়
শ্রীমতী করুণাময়ী ব্যানার্জি	: বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি, আস্‌লেহা গার্লস কলেজ
ড. মণিশঙ্কর অধিকারী	: হীরালাল ভকত কলেজ, শিক্ষক প্রতিনিধি
অধ্যাপক শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জি	: হীরালাল ভকত কলেজ, শিক্ষক প্রতিনিধি
শ্রী সুভাষ ভৌমিক	: হীরালাল ভকত কলেজ, শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি
শ্রী অসীম কুমার ভড়	: হীরালাল ভকত কলেজ, শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি
সালাউদ্দিন সেখ্	: জি.এস., ছাত্র-সংসদ, ছাত্র প্রতিনিধি

বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক—শ্রী দেবব্রত সাহা

বাণিজ্য বিভাগ :

ড. রঞ্জিত কুমার সরকার, সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি।

অধ্যাপক বিমল পাল, সহযোগী অধ্যাপক, বাণিজ্য।

অধ্যাপক সলিল কুমার সেনগুপ্ত, সহযোগী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান।

একজন অঙ্কের শিক্ষক পদ শূন্য।

শ্রী সুখেন কুমার মণ্ডল, অংশকালীন অধ্যাপক।

শ্রী গৌতম কুমার মণ্ডল, অংশকালীন অধ্যাপক।

শ্রী সুরজিৎ সিন্‌হা, অতিথি অধ্যাপক।

বাংলা বিভাগ :

ড. চৈতন্য বিশ্বাস, সহযোগী অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক প্রাতর্বিভাগ।

ড. মণিশঙ্কর অধিকারী, সহকারী অধ্যাপক।

অধ্যাপিকা শিল্পি দাস, সহকারী অধ্যাপক।

ইংরেজি বিভাগ :

অধ্যাপক গৌতম সেন, সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান।

অধ্যাপক শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জি, সহকারী অধ্যাপক।

একজন পূর্ণ সময়ের শিক্ষক পদ শূন্য।

অধ্যাপক আব্দুর রেকিব, অতিথি অধ্যাপক।

ইতিহাস বিভাগ :

অধ্যাপক সুকুমার মণ্ডল, সহকারী অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান।

অধ্যাপিকা অমৃতা বিশ্বাস, সহকারী অধ্যাপক।

একজন পূর্ণ সময়ের শিক্ষক পদ শূন্য।

শ্রী নেকশাদ খান, অতিথি অধ্যাপক।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ :

অধ্যাপক সৈয়দ মানোয়ারুজ্জামান, সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান।

একজন পূর্ণসময়ের শিক্ষক পদ শূন্য।

শ্রী নীলমণি মুখোপাধ্যায়, অংশকালীন অধ্যাপক।

শ্রীমতী তনুশ্রী সিন্‌হা, অংশকালীন অধ্যাপিকা (প্রাতর্বিভাগ)।

দর্শন বিভাগ :

অধ্যাপক দেবব্রত সাহা, সহকারী অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান।

দর্শন বিভাগ ঃ
একজন পূর্ণ সময়ের শিক্ষকপদ শূন্য।
শ্রী রণজয় খান, অংশকালীন অধ্যাপিকা।
শ্রীমতী তনুশ্রী দাস, অংশকালীন অধ্যাপিকা।
শ্রীমতী মৌমিতা ব্যানার্জি, অতিথি অধ্যাপিকা (প্রাত বিভাগ)।
শ্রী নাজমূল হাসান, অতিথি অধ্যাপক।

সংস্কৃত বিভাগ ঃ
শ্রীমতী সুনন্দা বিষ্ণু, অতিথি অধ্যাপিকা।
শ্রী প্রীতম রুজ, অতিথি অধ্যাপক।
শ্রী অতনু ভট্টাচার্য, অতিথি অধ্যাপক।

ভূগোল বিভাগ ঃ
শ্রী নীলাদ্রি দাস, অতিথি অধ্যাপক।
শ্রী সুরজিৎ দাস, অতিথি অধ্যাপক।
শ্রীমতী সামসুন নেহার, অতিথি অধ্যাপিকা।

পরিবেশ বিদ্যা বিভাগ ঃ
অধ্যাপক কৃতীমান বিশ্বাস, সহকারী অধ্যাপক।
শ্রীমতি তাপসী মুখোপাধ্যায়, অংশকালীন অধ্যাপিকা।

শরীরবিদ্যা বিভাগ ঃ
শ্রীমতী সুমনা ঘোষ, অতিথি অধ্যাপিকা।
শ্রী বর্ষণ ঘোষ, অতিথি অধ্যাপক।

উর্দু বিভাগ ঃ
শ্রী বাবুল আলম, অতিথি অধ্যাপক।

অর্থনীতি বিভাগ ঃ
একজন পূর্ণসময়ের শিক্ষক পদ শূন্য।

গ্রান্থাগারিক ঃ
শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়

শিক্ষা সহায়ক কর্মীবৃন্দ

শ্রী ধনপতি মণ্ডল, প্রধান করণিক।
শ্রী সুভাষ ভৌমিক, হিসাবরক্ষক।
শ্রী অসীম কুমার ভড়, ক্যাসিয়ার।
শ্রী মলয় মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থাগার করণিক।
শ্রী ইন্দ্রজিৎ কুমার সাও, টাইপিষ্ট ক্লার্ক।
শ্রী শিশির দাস, করণিক।
শ্রী হুমায়ুন কবীর, ইলেকট্রিসিয়ান।
শ্রী পিন্টু মল্লিক, করণিক।
শ্রী আব্দুল বাসির, পিওন।
শ্রী পরেশ কুমার পাল, দরোয়ান।
শ্রী কৃষ্ণগোপাল লাহা, পিওন।
শ্রীমতী কৃষ্ণা নাথ, লেডি অ্যাটেন্ড্যান্ট।
শ্রী গণেশ প্রসাদ সাহানী, জেনারেটার অপারেটার।
শ্রী চন্দ্রশেখর লেট, লাইব্রেরী পিওন।
শ্রী নিখিল কুমার ফুলমালী, অংশকালীন সুইপার।
শ্রী তকবীর সেখ, অংশকালীন সুইপার।
শ্রী রমেশ মাল, অংশকালীন গার্ড।
শ্রীমতী চয়না ঘোষ, কম্পিউটার সহায়িকা।

হীরালাল ভকত কলেজ ছাত্র-সংসদ—২০১৪-১৫

অধ্যাপক দেবব্রত সাহা, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং সভাপতি।
শ্রী রিপন সেখ, সহ সভাপতি।
শ্রী সালাউদ্দিন সেখ, সাধারণ সম্পাদক (জি.এস.)
শ্রী চন্দন দাস, সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এ.জি.এস.)
শ্রী মেহেবুব সেখ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক
শ্রী সুব্রত দত্ত, ক্রীড়া সম্পাদক (আউটডোর)
শ্রী মাহাদুল হোসেন ও রেয়াজুদ্দিন সেখ, ক্রীড়া সম্পাদক।
শ্রী এমদাদুল হক্, ক্রীড়া সম্পাদক (ইন্ডোর)।
শ্রী জাহাঙ্গীর হোসেন, পত্রিকা সম্পাদক।
শ্রী অরিজিৎ লেট, দেওয়াল পত্রিকা সম্পাদক।
শ্রী তোতন হোসেন, বয়েজ কমন রুম সম্পাদক।
শ্রীমতী আসেকা মেহেরুন (পলি), গার্লস্ কমনরুম সম্পাদক।
শ্রী হান্নাফ হোসেন, বুকব্যাঙ্ক সম্পাদক।
শ্রী আকাশ ভকত, এন.সি.সি. সম্পাদক।
শ্রী ডাক্তেল মণ্ডল, এন.সি.সি. সম্পাদক।
মহ. কামাল হোসেন, ক্যান্টিন সম্পাদক।
শ্রী রোউনক মাহেশ্বরী, গ্রন্থাগার সম্পাদক।
শ্রী মাখন চিল্লাঙ্গীয়া, গ্রাউণ্ড সম্পাদক।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
● পরিচালন সমিতির সভাপতির প্রতিবেদন		৫
● ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের প্রতিবেদন		৭
● পত্রিকা সম্পাদকের প্রতিবেদন		৯
কবিতা ও ছড়া :		
১। সাহিত্য	শ্রেয়সী রুদ্র	১৭
২। নিবেদন	সুনন্দা বিষ্ণু	১৭
৩। মানুষ কী চায়	আসরাফুল আলম	১৮
৪। আমার পরিচয়	বদনকৃষ্ণ প্রামাণিক	১৮
৫। মোবাইল	প্রসেনজিৎ রাজবংশী	১৯
৬। সুখ দুঃখ	শ্রাবণী মার্জিত	১৯
৭। সোনালী বাংলা	শ্রীনাথ মণ্ডল	২০
৮। স্বপ্ন দেখো নতুন আলোর	শের আলি	২০
৯। অন্তিম যাত্রা	প্রিয়া মাল	২১
১০। বারো মাসের কবিতা	সঙ্গীতা কর্মকার	২১
১১। চাই নতুন স্বাধীনতা	ইন্দ্রাণী দাস	২২
১২। বন্ধু	চৈতালী রায়	২২
১৩। স্মৃতির কথা	চিরঞ্জিৎ মাল	২৪
১৪। টাকার নোট	অরিন্দম মণ্ডল	২৪
১৫। শরৎ কালের সৌন্দর্য	সুরজিৎ মণ্ডল	২৬
১৬। পরিবর্তন	সঞ্চিতা প্রামাণিক	২৬
১৭। স্বপ্ন	সুরভী নসিপুরী	২৭
১৮। শত ভাবনা	সাদেমুন খাতুন	২৭
১৯। বৃষ্টি	তৃষ্ণা সাহু	২৮
২০। গ্রাম	পম্পা মণ্ডল	২৮
২১। ভারতবাসী	আজহারুদ্দিন মল্লিক	২৯
২২। সে হতে চেয়েছিল	জয়ন্তী কোনাই	২৯
২৩। পরিবর্তন	মিতা রাণী মাল	৩০
২৪। কলির কবি	অনুরূপ পাল	৩০
২৫। Hope	Jyoti Chowdhury	৩১
২৬। The Earth	Joy Islam Choudhury	৩১
২৮। আপন পর	কাজল শ	৩২
২৯। ভোর	পল্লবী মণ্ডল	৩২
৩০। I need to learn the Harmony	Abdul Rakib	৩৩

গল্প ঃ
১। স্বপ্ন ভঙ্গ — হাসান শেখ — ৩৪
২। নিষ্ঠুর নিয়তি — মিনি চক্রবর্তী — ৩৬
৩। সে কে? — অমিত পণ্ডিত — ৩৮
৪। ডাক্তার — অমৃত পাল — ৪০
৫। মজিবরের মেয়ে — মফিজুল সেখ — ৪২
৬। হাজিরা — ড. রঞ্জিত কুমার সরকার — ৪৪

ভ্রমণ কথা ঃ প্রতিযোগিতার রচনা ঃ
১। বোলপুর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা — মন্দিরা প্রামাণিক — ৫১
২। শান্তিনিকেতন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা — মুস্তাফিজুর রহমান — ৫৩

প্রবন্ধ ঃ
১। নির্বাক নজরুল কথা — ড. চৈতন্য বিশ্বাস — ৫৬
২। মন চলো যাই আনন্দ নিকেতনে — বিমল পাল — ৬১
৩। তরুণ ছাত্র সমাজ ও অভিভাবকদের কর্তব্য — তারাপ্রসাদ নরসুন্দর — ৬৩
৪। 'ফ্রান্সিস ফুকোয়ামা ও তার ইতিহাসের সমাপ্তিতত্ত্ব' — সৈয়দ মানোয়ারুজ্জামান — ৬৫
৫। Environmental Pollution : Source and its Impact — Kritiman Biswas — ৬৮
৬। Sallekhana : A Distinctive type of Voluntary Death — Debabrata Saha — ৮১
৭। Construction of widowhood in Late 19th Century Early 20th Century Bengali Fiction — Suddhasattwa Banerjee — ৮৫

২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের 'দিশারী' পত্রিকা উদ্বোধন অনুষ্ঠান।

২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-সংসদ।

দিশারী

ছাত্র-সংসদের কয়েকজন সদস্য।

অধ্যাপক দেবব্রত সাহাকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হিসেবে বরণ করে নিচ্ছেন
কলেজে প্রবীণ অধ্যাপক ড. চৈতন্য বিশ্বাস।

দিশারী

২০১৫-এর জানুয়ারীতে শান্তিনিকেতনে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা।

সাহিত্য

শ্রেয়সী রুদ্র
তৃতীয় বর্ষ, বাংলা

হে সাহিত্য, তুমি সৃষ্টির বুকে সুন্দর।
যখন পৃথিবী জন্মক্ষণে প্রথম ক্রন্দন করেছিল,
তখন তুমি তার মর্মগর্ভ থেকে উৎসারিত হয়েছিলে।
আমি কবি তোমার সাথে সুর মিলিয়ে প্রলয় নৃত্য তুলে
আপনাকে রাখলো ব্যপ্ত করে অসীমের পানে।
আর তুমি রইলে উভয়ের যোগসূত্র হয়ে।
সৃষ্টি চায় আপনাকে রিক্ত করে পরমের সাথে মিলে যায়,
পারে না মিলতে, বেদনায় আর্ত হয়ে ওঠে।
কেবল চক্ষুতে চক্ষুতে মিলন হয় আর সেখান থেকেই
আবির্ভাব হয় তোমার, আপনার মাধুর্য বোধ সম্পৃক্ত করে।
দুই পারে দুজন মাঝে তোমার সুরধুনী।
তাই সৃষ্টি হয়—আবেগ আকুলতার, তুমি তাদের অধীশ্বরী।

আপনার পরিচয় ব্যক্ত করতে চাও আজও, তাই তুমি,
মানবের চেতনায় অস্ফুট গুঞ্জন তুলে,
হিল্লোলিত কর, যে তোমার বাণীর অনুভব প্রাপ্ত হয়
সেও হয়ে ওঠে—আরো এক কবি—
তোমারই বর পুত্র, ভাবের ইঙ্গিতে না বলা কথা
মূর্তি হয় প্রকাশ, প্রতিষ্ঠা কর নিজেকে।
তুমি সুন্দর, চিরন্তন, আনন্দ।

নিবেদন

সুনন্দা বিশু
সংস্কৃত বিভাগ, অতিথী অধ্যাপিকা

তব বাণী অন্তরে বাঁধিয়া,
ভুলেছিনু মন চিন্তা।
করেছিনু যখন যতনে সাধনা,
তখন রঙ্গমঞ্চ কেন দিলে—
মোর তরে শূন্যতায় ভ'রে!
বসি আমি গৃহপার্শে, একা—
একাকিনী ভাবি নিরন্তর
তব তুল্য আছে—
এ ভব সংসার।
সাঙ্গ হবে যবে মোর খেলা,
তব লীলা হবে শুরু,—
তখন না হয় মোর জন্ম দিও
এ ধরণীতটে।
তব বংশীসুর বাজিবে কর্ণকুহরে,
না জানি সেই সুর শুনিতে কেমনি হবে।
দিবা নিশি বহিয়াতো যায়,
কত সংসার তাতে গড়ে,
সে হিসাব রাখো প্রভু,
তব পার্শ্বে।
জানাই ধন্য তুমি, ধন্য তব কাজ
নতমস্তকে প্রণমি তোমায় আমি,
দিও তব আশীর্বাদ
রাখিও আমার তরে তব আঁখিপাত।।

মানুষ কী চায়

আসরাফুল আলম
বি.এ., তৃতীয় বর্ষ, দর্শন (অনার্স)

মানুষ ভালোবাসতে চায়,
প্রাণভরে আনন্দ চায়,
আনন্দিত করতে জানেনা।
মানুষ সুখ চায়—নিজের জন্য—
কাউকে সুখী করতে পারেনা।
মানুষ নিজেকে ভালোবাসতে চায়,
কিন্তু ভালোবাসতে জানে না,
ভালো হ'তে জানে না।
হতাশা ঘুচিয়ে মানুষ জীবনে আলো চায়
আলোকিত করতে জানে না।
বিষণ্ণ, গোমড়ামুখো সংসারে মানুষ হাসতে চায়,
কিন্তু হাসাতে জানে না কাউকে,
উদ্বেগে হাপিয়ে ওঠা মানুষ জীবনে খুশি চায়,
কিন্তু খুশি করতে পারে না কাউকে।
প্রকৃতপক্ষে মানুষ যে কী চায়,
তা' সে নিজেও জানে না।।।

আমার পরিচয়

বদন কৃষ্ণ প্রামাণিক
বি.এ., তৃতীয় বর্ষ, দর্শন (অনার্স)

নইতো আমি ধনীর পুত্র
নইতো রাজার কুমার
অর্থে গরীব সারা জীবন
পিতা মাতা আমার।
দুটো দিদির পরে একা
জন্ম নিলাম আমি
তাইতো আজকে তাদের কাছে
সবার চাইতে দামী।।
জীবন যুদ্ধে বারংবার যে
যাচ্ছি আমি হেরে,
তবু আমি যাবো নাতো
তাদের থেকে স'রে।।
দরিদ্রতা বন্ধু হ'ল।
দু:খ জীবন সাঁথী;
বৃষ্টিতে স্নান—রৌদ্রে দহন,
জোটেনা মাথায় ছাতি।
বাবা-মাকে বাসি ভালো,
দিদিরা আমার প্রাণ,
আমাকেই তো রাখতে হবে
সকলের সম্মান।।
স্বপ্ন পূরণ করতে তাদের
সদা চেষ্টা করি,
সবার আশিস চাই গো আমার,
এই আবেদন করি।।

মোবাইল ফোন

প্রসেনজিৎ রাজবংশী
দর্শন বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ

আমার নামটা মোবাইল,
সবার কাছেই থাকি,
চেহারাটা ছোট হলেও
অনেক শক্তি রাখি।
এই দুনিয়ায় থাকতে ভালো
কার কাছে বা যাবে,
যা দরকার বিনোদনের—
আমার কাছেই পাবে!
মানুষকে তাই হাসাই কাঁদাই,
কারো বাঁধাই ঘর,
সুখ দুঃখের সঙ্গী আমি,
নই গো কারো পর।
তোমরা মানুষ, অহংকারী,
সর্বদা সংঘাত—
আমিই শুধু সাক্ষী থাকি
অতন্দ্র, দিন রাত।
ভালো কাজের যেমন সঙ্গী
তেমনই মন্দ কাজে,
তাই তো কেউ বা সোহাগ করে,
কেউ বা বলে 'বাজে'।

সুখ দুঃখ

শ্রাবণী মার্জিত
বি.এ., প্রথম বর্ষ

জীবনের মানে হাসিখুশি আর
জীবনের মানে কান্না,
জীবনের মানে জেনে বুঝে কেউ
দুঃখী হতেও চান না।

সুখের পিছনে ছুটছে সবাই
ক'জনই বা সুখী হয়,
তবুও সবাই জানবে জীবনে
কেবল দুঃখ নয়।

সুখ ও দুঃখ চাকার মতই
ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে,
দুঃখের দিনে কাঁদবে মানুষ,
সুখ ফিরে এলে হাসে।।

সোনালী বাংলা

শ্রীনাথ মণ্ডল
ইতিহাস, প্রথম বর্ষ

আমার এ সোনালী বাংলায়—
আমি পুনরায় যেন জন্মাই।
মানুষ কিম্বা, কোকিলের বেশে জন্মাই।
সুজলা-সুফলা বাংলায়
আমি পুনারায় যেন জন্মাই।

বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, নজরুল,
নেতাজী সুভাষ, বিবেকানন্দ, এই বাংলার কত ফুল!
মাটি-নদী-বন-আকাশ-বাতাস
যাঁদের স্পর্শে পেল আশ্বাস—
সে মহানদের পদরেণু মাখা বাংলায়
পুনরায় যেন জন্মাই।

রঙিন প্রকৃতি মনোরম পরিবেশে
বেড়াবো ইচ্ছা আরো একবার এসে!
শতেক পাখির কাকলীর সাথে কোকিলের কুহু তান
শত দুঃখের মাঝেও আমার ভরে দেয় মন প্রাণ।
রাত্রি যেখানে চুপি চুপি নেমে আসে,
আঁধার ঘুচিয়ে রোদ খেলা করে ঘাসে।
এই বাংলার রূপের কথা তো বলবার শেষ নাই—
এই খানে যেন মানুষ, কিম্বা
পাখি হয়ে জন্মাই।

স্বপ্ন দেখো নতুন আলোর

শের আলি সেখ
বি.এ., তৃতীয় বর্ষ

স্বপ্ন দেখো নতুন আলোর;
নতুন পাওয়ার আশায়।
স্বপ্ন দেখো সত্যি হবে—
অমর ভালোবাসায়।।
স্বপ্ন দেখো পৃথিবীতে—
পাবে তুমি আলো;
স্বপ্ন দেখো সত্যি হবে—
বাসবে সবাই ভালো।।
স্বপ্ন দেখো মনটা ভরবে—
ভাসবে আকাশেতে;
স্বপ্ন দেখো সত্যি হবে—
যাবে নতুন দেশে।।
স্বপ্ন দেখো ডাক্তার হবে—
হবে অন্য কিছু;
স্বপ্ন দেখো সত্যি হবে—
ছেড়োনা পড়ার পিছু।।
স্বপ্ন দেখো নতুন আলোর,
স্বপ্ন দেখো ফুল;
কিন্তু বন্ধু হয় না যেন,—
মানুষ চিনতে ভুল।।

অন্তিম যাত্রা

প্রিয়া মাল
বি.এ., প্রথম বর্ষ

সকল বাধা ছিন্ন করে
যাব যেদিন চ'লে
সঙ্গে কিছু নেবো নাতো
সবই রাখব ফেলে।
মুক্ত হবো আমি সেদিন,
সকল মায়া থেকে—
ঘুরেও তখন দেখবো নাকো
কাঁদছে বসে কে কে?
করছে কারা অনুসরণ,
আমার যাত্রা পথে।
পিছনে ফেলে দেব তাদের
নেব নাতো সাঁথে।
ভুলে আমি সকল স্বজন
সকল বন্ধুগণ;
কারো জন্য কাঁদবে নাকো
মুক্ত আমার মন।
অচেনা সেই যাত্রা পথে
দিতে গিয়ে পাড়ি,
দরকার আর থাকবে না যে
আমার জন্য গাড়ি।
ধন-সম্পদ নিয়ে সেদিন
দ্বন্দ্ব হবে শেষ,
একাই আমি পৌঁছে যাবো
অচেনা সেই দেশ।।

বারোমাসের কবিতা

সঙ্গীতা কর্মকার
বি.এ., প্রথম বর্ষ

বৈশাখেতে আনল ঝড়-আর
জৈষ্ঠ্য আনে রোদ;
আষাঢ় মাসে বৃষ্টি পড়ে
শ্রাবণ মাসে ক্রোধ।
ভাদ্র মাসে ভাদু নাচ আর
কে দেখবে বলো?
আশ্বিনেতে দুর্গা পুজা
আকাশ ঝলমল!
কার্ত্তিক মাসে ভাই ফোঁটা, ভাই,
অঘ্রানে নবান্ন—
পৌষ মাসে পৌশালো আর
নতুন ধানের অন্ন।
মাঘ মাসে পূজো আছে
সরস্বতী মা'র,
ফাল্গুনেতে রঙের খেলা
আনন্দ অপার।
চৈত্র মাসে শিবের গাজন
সেলের কেনাকাটি;
বর্ষ শেষের কথা মনে
পড়ায় ঢাকের কাঠি।

চাই নতুন স্বাধীনতা

ইন্দ্রাণী দাস
সংস্কৃত বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ

সেদিনের কথা ভুলিয়া গেলেও বলছি না তাকে মিছে;
সব কিছুতেই এগিয়েছিল সে, এবার কিন্তু পিছে।
ভারতবর্ষ আমাদের দেশ মায়েরই মতন মানি,
কত যে ভাষার দেশ আমাদের পরিবার এক খানি।
গান্ধীজি, আর ভকত সিং বা নেতাজী, ক্ষুদিরাম—
আরো শতশত বিপ্লবী যাঁরা লড়েছেন অবিরাম,—
যাঁদের রক্তে হয়েছি স্বাধীন, তাদের ভুলতে পারি।
বলতে পারেন, কী নেই এদেশে? সব সম্পদে ভারী;
তাহার প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েই ঘটাচ্ছি ভরাডুবি,
জানি না কবে যে উঠবে এদেশে নতুন আলোর রবি।
বাঁচবো সবাই সমানভাবেই থাকবে না বিষমতা,
আর যদি পাই কোনোদিন ভাই, নবতর স্বাধীনতা,
আনবো সবারে একই ছত্রের নীচে,—
থাকবে না সেথা আমির-গরীব, কেউ নয় কারো পিছে।
বিশ্বের যত শ্রেষ্ঠ আসনে বসবে এ দেশবাসী,
মিছে কথা নয়, একদিন ঠিকই এ মুখে ফুটবে হাসি।।

বন্ধু

চৈতালী রায়
বি.এ., দ্বিতীয় বর্ষ

বন্ধু মানে স্বপ্ন দেখা
সবুজ পাহাড় দেশে।
বন্ধু মানে হৃদয় দোলা
আলতো ভালোবেসে।
তোর জন্য আনতে পারি
আকাশ থেকে তারা।
তোর জন্য বাঁচতে পারি
অক্সিজেন ছাড়া।
তোর জন্য আনতে পারি
অন্ধকারে আলো।
তোর সঙ্গে থাকবো আমি
সারা জীবন ভালো।
তোর হাতে হাত রেখে আমি
চলবো কঠিন পথ।
ভয় পাব না কোনো মতেই
নিচ্ছি যে শপথ।।

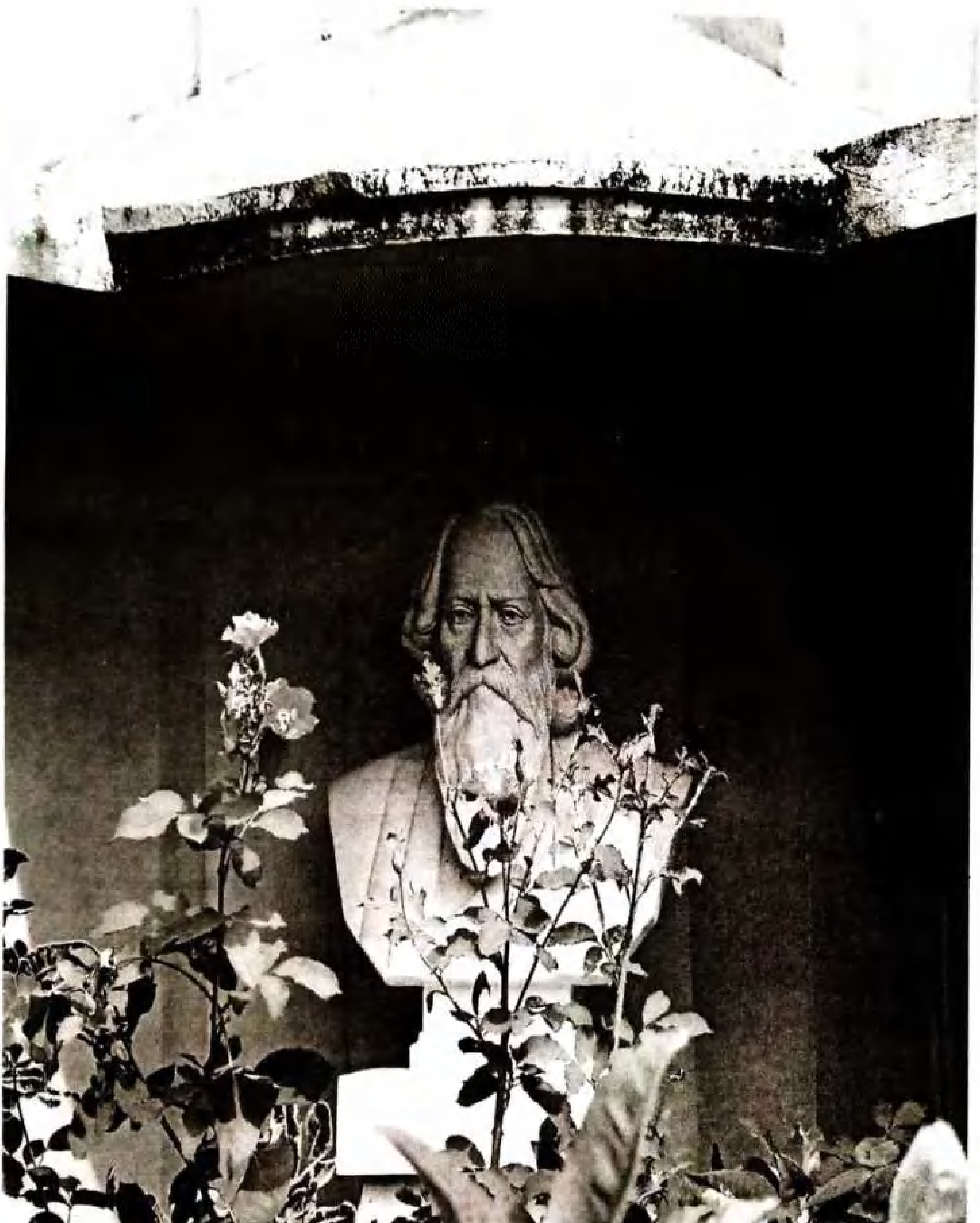

স্মৃতির কথা

চিরঞ্জিত মাল
বি.এ., দ্বিতীয় বর্ষ

নাইবা পেলাম জীবনের স্বাদ নাইবা পেলাম প্রাণ
আমি তবু গাইব শুধু জীবনের জয়গান।
জীবন হল বেঁচে থাকার সুখ দুঃখের মেলা
কেউ পাবে সুখ কেউবা দুঃখ এইতো বিধির খেলা।
লড়াই ক'রে বাঁচব সবাই বিধির এ সংসারে,
লড়াই হ'লে জিতবে কেউবা, কেউবা যাবে হেরে।
পুরোনো সেই স্মৃতির কথা পড়বে মনে যখন
স্মৃতির মাঝে ফিরে পাবো সুখের ছায়া তখন।
আসবে কিছু দুঃখ জানি, কাঁদবে গো বেদনায়,
তাই বলে কি একলা দেখব পথের ধারে তোমায়!
ভেবো না আর আগের কথা দুঃখ পাবে জানি।
আগে যেমন ছিল জীবন আজকেও তেমনি।
তবু তোমার মানবে না মন, কষ্ট পাবে তুমি
আজকে তোমার স্মৃতির আকাশ স্পর্শ করবে তুমি।
বয়ে চলা নদীর মতন চলতে হয় একাকী,—
বলো তোমার চলার পথের সঙ্গী কাকে ডাকি।
কথায় কথায় ঝরবে শুধু তোমার চোখের জল,
তবুও জেনো নয়গো তোমার এই চলা নিস্ফল।

টাকার নোট

অরিন্দম মণ্ডল
বি.এ., তৃতীয় বর্ষ

আমি একটি 'নোট', টাকার নোট,
এই তো সেদিনই দেখা হল—
আমার মতনই একজনের সঙ্গে,
সে অবিকল আমার মতো, কিংবা নয়,
সে আমায় ব্যঙ্গ করে বলল—
সেও নাকি তৈরী হয়েছিল আমার মতন করে
নতুন কাগজে, টাকা ছাপবার মেশিনে
কিন্তু একটি, শুধু একটি জিনিসই হয়নি তার,
তাতেই তার জীবনটা শেষ হয়ে গেল।
এখন নাকি সে 'জাল' ব'লে
ধরা পড়েছে সে, নেই তার সরকারী ছাপ,
শুনে আঁতকে উঠলাম, 'কেন? কি তার পাপ?'
নিজেকে যাচাই করিয়ে নিলাম তার কাছে
সে বলল যে আমি আসল, সব ঠিক আছে।

আমি একটি 'নোট', টাকার নোট,
এই তো গতকালই দেখা হল
আমারই মতন একজনের সঙ্গে
সে অবিকল আমার মতো কিংবা নয়
যখন আমি তার দুর্দশার কারণ জানতে চাই,
সে রেগে গিয়ে বলল আমায়, হাসো তামাশা করে
তোমারই তো দিন, আমারও ছিল, হঠাৎ—

কিভাবে যেন শেষ হয়ে গেল। একটু দাগ,
একটু দাগই তো লেগেছে লাল রঙের, বিশ্বাস করো
আমার এতে দোষ নেই কোনো, এ দাগ নয় রক্তও নয়!
শুধু একজন মানুষ ভুল করে লাল কালি দিয়েছে লাগিয়ে!
আচ্ছা বলোতো, দাগই তো, তাতে কিই বা হয়েছে?
কত নারী-পুরুষ কত কলঙ্ক নিয়েও তো বেঁচে থাকে,
সরকার তাদের সাহায্য করে, দেয় সহানুভূতিও
বাঁচার পথ দেয়, তবে আমি কেন এইভাবে হবো হেয়?
সেও বলল, সুখের দিন কাটিয়ে নাও বন্ধু,—
দাগ তো লাগেনি, যেদিন লাগবে কষ্টটা বুঝবে তুমিও।

আমি একটি 'নোট', টাকার নোট,
আচ্ছা আমি তো 'জাল' নই, লাগেনি
আমার উপর কোনো দাগও, যেমন
অন্য ভালো নোট তৈরী হয় আমিও
তৈরী হয়েছিলাম; একজনের হাত থেকে অন্যজনের হাতে
ঘুরেছি আমি, কাটিয়েছি খুসির দিনও
ভাবিনি এমন দিন আমার জীবনে আসবে!
কি হয়েছে, একটু যদি ছিঁড়েই গিয়েছে, তবে—
কত মানুষ, পশু তাদের হাত-পা ছাড়াও থাকে
বেঁচে, পায় প্রতিবন্ধীর মর্যাদা-সুযোগ! আমার ভাগ্যে
তবে নয় কেন? বিশ্বাস করো, ছেঁড়াটা হয়নি
আমার দোষে, দুটি ছোট ছেলে করছিল টানাটানি
আমায় নিয়ে, তাতেই সব শেষ। কিই বা
করার ছিল আমরা? আমি তো প্রতিবাদ করতে পারি না।

জীবনে কখোনো শুনেছিলাম নাকি ছেঁড়া টাকা
থেকে আবার নতুন টাকা হয়ে জন্মানো যায়,
যদি কোনো মানুষ এগিয়ে এসে আমায় দিত
নতুন জীবন, মনে খুব আনন্দ হত।
কিন্তু, কই? কেউ তো এলো না! তবে কি
আমার মূল্য কম বলে তাদের পোষাল না
এতটুকু কষ্ট করবার? তবে ভেবে দেখলাম, না,
ভালোই হয়েছে, যখন জানলাম যে আমি
আর আমি থাকব না, আমায় পুড়িয়ে
অন্য কেউ জন্ম নেবে, আমার নামে।
সে-তো আমি নই, অন্য কেউ, তবে কেন আমি
পুড়ব? অবশ্য এখন তো আমি পড়ে আছি
ডাস্টবিনে, নোংরায়, যে টাকা এতদিন পেত শোভা,
সুন্দর মানিব্যাগে, তার আজ এমন দুর্গতি।
ধীরে ধীরে আমি মিলিয়ে যাব, পরিবেশের মধ্যে।
পরিবেশ-বাধব তো আমি, কাগজের তৈরী,
জীবনে এর চেয়ে বেশী আর কিই বা চাইতে পারি?

শরৎকালের সৌন্দর্য

সুরজিৎ মণ্ডল
বাংলা বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ

অতিবর্ষণ শেষ হয়ে আজ শরতের আগমন,
ধরণী সেজেছে নবরূপে তাই নেচে ওঠে মোর মন।
চারিদিকে ফুটে রয়েছে শুভ্র কাশফুল রাশিরাশি।
মন ভরে যায়, যেদিকে তাকাই, যেন গো মায়ের হাসি!
নীল আকাশের নিম্নে সবুজ প্রশান্ত ধানক্ষেত—
কাননে ফুটেছে রাশিরাশি ফুল—লাল-নীল আর শ্বেত!
বিশাল জলায় সাঁতার কাটছে হংসেরা খুশী ভরে,
মৃদুল বাতাস সবুজ গাছের পাতা নিয়ে খেলা করে।
মন ভালো হওয়া দিনের আলোয় কানে ভেসে আসে সুর,
আনন্দময়ী মা'র আগমন আর নহে বেশী দূর।
নীল আকাশের সমুদ্রে ভাসে পাল তোলা সাদা মেঘ,
ভাসে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে, নেই তার গতিবেগ।
আমার মনটা মেঘ হতে চায়, উড়ে যেতে চায় দূরে,
শরতের সৌন্দর্যের স্বাদ নিতে উপভোগ ক'রে।

পরিবর্তন

সঞ্চিতা প্রামাণিক
বি.এ., তৃতীয় বর্ষ

ডুবরীর মতো ডুবে যাও যদি
জ্ঞানের সাগর তলে,
পাবেই রত্নধন।।

বিজ্ঞ জনের স্পর্শে যদি গো.
থাকো চিরকাল সুখে,
উদার হইবে মন।।

তমসা ঘোচে গো আলোর প্রকাশে,
অজ্ঞতা ঘোচে জ্ঞানের বিকাশে।
জীবনে আছে যা দুঃখ-যন্ত্রণা।
আত্মজ্ঞানই দিবে তাকে সান্ত্বনা।।

অজ্ঞান জন সদাই নির্বোধ।
অজ্ঞতা হেতু বাড়ায় দুর্ভোগ।।

হিংসা অত্যাচারে কৃপাণ যাদের,
অহিংসা মন্ত্রে জাগাও তাদের।
প্রেম-প্রীতি-পূণ্য বাঁধনে বাঁধিয়া
থেকো গো তাদের সাথে।।

স্বপ্ন

সুরভী নসিপুরী
বি.এ., দ্বিতীয় বর্ষ

সে স্বপ্ন দেখে, শুধুই স্বপ্ন দেখে
লেখাপড়ায় তার মন বসেনা।
সে ছুটে যাবে পাহাড়ে, সাগরে, জঙ্গলে
এই স্বপ্ন দেখে সে, শুধুই স্বপ্ন দেখে।
ঘরের কাজে তার মন নেই,
সে স্বপ্ন দেখে পাখির মতো উড়বে নীলাকাশে
সে স্বপ্ন দেখে, শুধু স্বপ্ন দেখে।
শোনেনা মা-বাবার কোনো কথা,
সে ফুলের মতো ফুটে উঠবে
স্বপ্ন দেখে, শুধু স্বপ্নই দেখে সে।
সবাই বলে, স্বপ্ন দেখে মেয়েটা পাগল হয়ে যাবে।
তবু সে পারে না স্বপ্নের সাথ ছাড়তে,
স্বপ্নকে যেন সে চিরসঙ্গী করে ফেলেছে।
সর্বক্ষণের সাথী তার এই স্বপ্ন,
স্বপ্নকে নিয়েই তার পথচলা।
স্বপ্নের সাথে চলতে চলতে একদিন,
সে স্বপ্নের সাথেই মিলিয়ে গেল।
হয়তো স্বপ্নের মাঝেই খুঁজে পেল নিজেকে,
ওই দূরের আকাশে চাঁদ তারার মাঝখানে।

সৎ ভাবনা

সাদেকুন খাতুন
বি.এ. তৃতীয় বর্ষ, বাংলা

ছুটির দিনে ভাবছি বসে
লিখবো কিছু তাই।
স্যার বলেছেন লিখতে হবে
চেষ্টা করি তাই।
কবিও নই লেখকও নই
নই আমি বিদ্বান।
ভালো কিছু লিখতে যাবো
কতই বা মোর জ্ঞান।
যা খুশি তাই হয় না লেখা
সাহস রাখা চাই।
ভুবন মাঝে এই সাহসেই
হবে যে মোর ঠাঁই।
জানি আমার কবিতা লেখা
বৃথাই করি চেষ্টা,
তবুও আমি ছাড়বো না হাল
লাগুক খিদে-তেষ্টা
আজতো আমি পণ করেছি
লিখতে কিছু হবে।
এমনি করে চেষ্টা আমার
সারা জীবন রবে।

বৃষ্টি

তৃষ্ণা সাহু
বি.এ., প্রথম বর্ষ (বাংলা অনার্স)

গ্রীষ্মের পরে বর্ষা এসেছে
নেমেছে যে আজ বৃষ্টি;
ধরাতল তাই শ্যামল—সবুজ
এ কি অপরূপ সৃষ্টি!
প্রভাত সূর্য পূর্ব গগনে,
মেঘ ভাঙা রোদ উঁকি দেয় মনে,
চাতকের চোখ মেঘলা আকাশে,
সেও চায় আজ বৃষ্টি।
কলকাকলিতে মধু আলাপন,
জুঁই-চামেলিতে সুরভিত বন,
সফল হয়েছে ধরার স্বপন—
অপরূপ তাই সৃষ্টি।

গ্রাম

পম্পা মণ্ডল
ইতিহাস, প্রথম বর্ষ

আমাদের ছোটো গ্রামে ছোটো ছোটো ঘর
থাকিতো সবাই মিলে কেউ নই পর।
গ্রামের চারপাশে আছে গাছ কত শত,—
আমগাছ, জামগাছ আত্মীয়ের মতো।
আর আছে আমবন, তালবন মাঠ,
গ্রামের বামুন পাড়া, শান বাঁধা ঘাট,
গাছ গাছালির ঘরে পাখির কাকলি।
সেথায় তাদের বাসা কাকে বা কী বলি!
খোলা আকাশের খোলা বাতাসের চুমো,
সস্নেহে বলছে যেন ঘুমো, খোকা, ঘুমো।
সেই গ্রামে গয়না পরায় প্রজাপতি
সন্ধ্যায় কাকের দল গায় কালোয়াতি।
তারপর শুধু থাকে জোনাকির আলো—
আর থাকে আদিগন্ত কালো-আর-কালো।।

ভারতবাসী

আজহারুদ্দিন মল্লিক
তৃতীয় বর্ষ (দর্শন অর্নাস্)

তোমরা সোনার ভারতবাসী
সদাই থেকো ভালো।
খাটি সোনার এদেশটাকে
আপন করে পালো।।

দেশের মধ্যে ভালো মন্দ
লেগেই থাকে দ্বন্দ্ব।
মন্দটাকে সরিয়ে দিয়ে
আনাও কাজের ছন্দ।।

স্বাধীনতা লাভের আশায়
প্রাণ গেছে বলীদান।
তাঁদের মানটা বাঁচিয়ে রেখো,
ভারতীয় হে মহান।।

পরিবেশকে সুন্দর করে
ছোট্ট গাছের চারা।
ভারত মা'কে রাঙিয়ে দেবেই
ছোট্ট শিশু যারা।।

জন্মভূমির চরণতলে
সপে দিলাম প্রাণ।
ইতিহাসে থাকবে লেখা
সবার অবদান।।

সে হতে চেয়েছিল

জয়ন্তী কোনাই
বি.এ. (অনার্স), প্রথম বর্ষ

সে একটি ফুল হ'তে চেয়েছিল, সুন্দর, মনোহর!
সে হ'তে চেয়েছিল স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ—
চেয়েছিল, সবার মনে নিজের জায়গা করে নিতে;
চেয়েছিল মিষ্টি সুবাস দিতে চেয়েছিল সবার মনে
সোনালি, রূপালি রঙ ছড়িয়ে দিতে;
চেয়েছিল অনেক বর্ণ ধারণ করতে—
লাল, গোলাপী, নীল, হলুদ—
চেয়েছিল রামধনুর সাত রঙ নিয়ে
সবার মনে ছড়িয়ে দিতে,—
চেয়েছিল, মিষ্টি একটা গোলাপ হতে।
সবার মনের মতন করে নিজেকে সাজিয়ে তুলতে।
গোলাপ কী সে হতে পেরেছিল?
সে হতে চেয়েছিল রজনীগন্ধা,
সে কী পেরেছিল তা হতে।
পেরেছিল কি নিজেকে বদলে ফেলতে?

পরিবর্তন

মিতা রাণী মাল
তৃতীয় বর্ষ, বাংলা অনার্স

- যখন কুঁড়ি থেকে সবে ফুল হয়েছে
তখন রবি জেগে উঠলো নিজের মাঝে
শুনেছিল মা নাকি রবির জন্যে
স্বপ্ন দেখেছিল তাই রবি......।

- নয়ন মেলে রবি চেয়ে দেখলো
কিসের চিন্তা মায়ের চোখে মুখে
জিজ্ঞেস করল, মা তুমি আমায় দেখে
মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ কেন?

- মা কেন সেদিন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল
আজ তা রবি বুঝে গেছে
বর্তমানে রবিও একজন পিতা।

- যেদিন রবির শিশু জন্ম নিয়েছিল পৃথিবীতে
দুহাত দিয়ে রবি শিশুর গলা চেপে ধরেছিল
কেন এলি হতভাগা পৃথিবীতে?

- এই মাটিতে জমি আছে প্রচুর,
—খাবার নেই।
মানুষ আছে অনেক,
—হৃদয় নেই।
নেতা আছে অনেক
—সততা নেই।
তোর মতো ছেলে আছে অনেক
বাঁচার কোন নিশ্চয়তা নেই।

- হে ভগবান তুমি বলে দাও
এই সমাজতন্ত্র; গণতন্ত্র, ধনতন্ত্রের কি
পরিবর্তন হবে না কখনও
শিশু পাবে না কি তার অধিকার ও নিশ্চয়তা,
কার কথায় ভরসা করব আমরা!

কলির কবি

অনুরূপ পাল
বাংলা অনার্স, দ্বিতীয় বর্ষ

কলি কালের কবি আমি নেইতো কবির বেশ।
দোয়াত কালি নেইযে আমার, পেনের কালিও শেষ।
ভাবনা দিয়ে ভেবে আমি বিষয় পেয়ে যাই।
হঠাৎ দেখি টেবিলটাতে কাগজটাও নাই।।
মনের ভাষা আঁকা হলে হতাম কোনো কবি।
রবির মতোই একদিন বা হতাম বিশ্বকবি।।
স্বপ্ন আমার স্বপ্ন হয়ে মনেই রয়ে যায়।
কলির কালে কেন এলাম পেনের কালিও নাই।।
যখন আমার মনের মাঝে ভেসে ওঠে ছবি।
লিখতে যদি পেতাম কালি হতাম ঠিকই কবি।।
রবির মতোই ভাবনা দিয়ে লিখি গল্পছড়া।
বড়ো বড়ো বই লিখতাম যেতো নাকো ধরা।।
দু:খ একটা রয়েই গেল আমার মনের মাঝে।
পারলাম নাকো সাজতে আমি কবিত্বের ওই সাজে।।
সাহিত্যেও নামটা আমার হতো ঠিকই আঁকা।
কলির কালে জন্ম নিয়ে এলো সবই ফাঁকা।।
এইভাবে কি ভাবনা দিয়ে বিশ্বকবি হয়।
আমার স্বপ্ন, কবি হবো, আর কিছু তো নয়।।
মনের মাঝে বড়োই আশা নাড়াবো সারা দেশ।
কবি হয়ে যদি পায় সেই কবিত্বের বেশ।
আবোল-তাবোল লিখি শুধু যা এসে যায় মনে।
মনের ভাবনায় কবি যে হই অমিল ভাষার টানে।।
কলি কালে জন্ম নিলেও মানুষ তো হয়েছি।
মানুষের ওই পোশাক পরে মনটাও নিয়েছি।
মানবতার ভাবনা দিয়ে লিখব গো কবিতা।
সবার মনে রয়ে যাবে আমার এ ছবিটা।।

HOPE

Jyoti Choudhury
Ex-Student (English Honours)

The sky will survive.
The birds will be chirping in every grove......
with the impression of optimism.
All seasons will____appear on the beautiful scene.
The sun's smile will stay permanently.
In the garden, flowers will bloom in the
wind-soaked with dew.
The happiness will stay;
The sun will bring light.
The clouds will float in the lap in the sky.......
The meadow will be replete with the greenness.
The attachment of "auspicious look" will exist.
Everything will stay.
Every moment will bring hope.

THE EARTH

Joy Islam Choudhury
Ex-Student (English Honours)

You are the earth.
Thou art ever-damsel.
you are talking to me constantly............
How many men do your language understand?
Thou art even a magnificent woman.
In your lap endless streams of continuous onward
movement of life.
Even at the cost of your everything,
You are not destitute.............
in distribution your delectation.
Endless longevity is yours.
You are the earth.......
Thou art the earth.

আপন পর

কাজল শ
প্রথম বর্ষ, বাংলা

এ জগতে কে কার আপনজন, কতক্ষণ।
যার জন্য ভেবে মরি দিবস রজনী,
যে আমার নয়নের মণি।
যাকে বুকে বেঁধে নিয়ে তৃপ্তি পায় মন।
সেও চলে যায়।
হাজার কাঁদ্‌লেও কভু ফিরে না তাকায়।

এ জগতে যে আপন, একদিন সে পর হয়ে যায়।
পরম শত্রুও হয়, সহোদর ভাই
সম্পর্ক, আত্মীয়তা, দুটো মিষ্টি কথা—
সবই গুছিয়ে নিতে; তারপর অযথা—
দু'দণ্ড থাকে না আপনার।
তবুও আপন পর ভেবে যাই,
অকারণে করি কত অন্যায়!
প্রাণে তাই জাগে ভয় সারাক্ষণ—
এই বুঝি ঘটে কোনো অঘটন।।

ভোর

পল্লবী মণ্ডল
প্রথম বর্ষ

হঠাৎ একদিন ঘুম ভেঙে গেল।
শয্যা ছেড়ে ঘরের বাহিরে এসে দেখি,
তখনো দিনের আলো ফোটেনি তেমন,
উঠোনের কাছে বড়ো গাছটার ডালে
চেয়ে দেখি, একটা ছোটো পাখি
ঘুমিয়ে নিঝুম নিরালায়।
তারপর বাঁকা পথে চলতে গিয়ে দেখি,
তখনো আকাশে যেন দু-একটা তারা
জেগে বসে আছে অবসন্ন দেহ নিয়ে।
তিমির রাত্রিকে যেন তারারা তাঁদের
সামান্য আলোকে আলোকিত করেছিল।
কখন সূর্য উঠবে, আর তারা দল
সে আলোয় নিশ্চিন্তে ঘুমোবে।।

I NEED TO LEARN (THE) HARMONY

Abdur Rakib

Part-time Lecturer in English (Honorary)

S/he was born
She or he is born,
Another will be born,
To enrich the civilization of Man,
Or to diminish the stock of oxygen!-?
Man renews their own logic
Of Tacts and Merits,
For their own Loaves and fishes.
Who can lock man's sky-high desires of greed!
Who can destroy and stop
The evil flow of man's occupying
And enjoying the chairs?
The Earth wonders:
How the Resource/Wealth goes to Lockers
Of the few who indulge
in MOBOCRACY and VIOLENCE......
So much more questions and exclamations run..

O BIRDS! The INCARNATION OF PEACE!
Take me to thy SCHOOL
Of the Paradise-Nest,
Where the flag of zero violence flies,
To teach me the science of thy HARMONY,
For which I love to submit myself to thy Ethics,
I find no reason to be upset
And I like to know
The Gospel of thy society
Where the Mission of Peace works.
O the Little Find Species!
It is nice of Thee
To preach the big lessons of AMITY,
That run across the Globe
With the Flying Spirit of varied wings.
I need to learn the Grammar
Of thy amazingly amative Nature
That's the crying need of Man
I need to learn thy HARMONY.......
I need to learn THE HARMONY.......

স্বপ্নভঙ্গ

হাসান সেখ

বাংলা অনার্স (তৃতীয় বর্ষ) রোল- ২৫

নদীর দক্ষিণে পলাশ পুর নামে ছোট্ট একটি গ্রাম। গ্রামের পাশ দিয়ে নদীর ধার বরাবর শহরে যাওয়ার রাস্তাও চলে গেছে। পাশে একটি স্কুলও রয়েছে। অধিকাংশ লোকের জীবিকা কৃষি হলেও মতিনের জমি-জমা না থাকায় বাদামের ব্যবসা ক'রে কোনো রকমে সংসার চালায়। বাজার থেকে খোষা যুক্ত বাদাম ক্রয় ক'রে খোষাগুলোকে ছাড়িয়ে পুনরায় সেগুলো বিক্রয় ক'রে স্ত্রী ও ছেলের ভরনপোষণ করে।

মতিন-এর একমাত্র ছেলে হামিদ এবছর বিজ্ঞান বিভাগে স্টার মার্কস্ নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে। ছোটোবেলা থেকেই সে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও উচ্চমেধা সম্পন্ন। ছোটোবেলা থেকেই সে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্নেহ ও সাহায্য পেয়ে এসেছে। মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও স্টার মার্কস পেয়ে বাবা-মায়ের তো মুখ উজ্জ্বল করেইছিল, সাথে স্কুলের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছিল। উচ্চমাধ্যমিকেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

ছোটোবেলা থেকেই হামিদের স্বপ্ন, সে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হবে; কিংবা কোনো বড়ো চাকরি পেয়ে তার বাবা-মায়ের দুঃখ ঘোচাবে। কিন্তু তার বাবার সেরকম সামর্থ্য নেই যে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। বাবা বাদামের ব্যবসা করে ক-টাকাই বা রোজগার করে? কিন্তু হামিদের বিশ্বাস সে যেমন ক'রে হোক, তার লক্ষ্যে পৌঁছাবেই।

হামিদের ঘরটা দুই কক্ষ বিশিষ্ট ও খড় দিয়ে ছাওয়া। ঘরে হামিদের বাবা-মা বাস করে এবং অন্য পাশেই একটি ছোট্ট রান্নাঘর। ঘরের উঠোনটা খুব একটা চওড়া নয়। এখানেই হামিদের বাবা-মা বসে বসে বাদামের খোষা ছাড়ায়। লেখা-পড়া শেষ করে অবসর সময়ে হামিদও তার বাবা মাকে সাহায্য করে।

পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়, তাই দুই তিন বছর আগেই হামিদ টিউশনি পড়াতে আরম্ভ করেছিল। এতে তার নিজের লেখা পড়ার খরচ সহ সংসারের খরচও চলে যায়। যদিও সে নিজে টিউশনি পড়ত না। স্কুলের পড়া কঠোর ভাবে করত। সময়ের অপচয় করত না। স্কুলের ছুটির ঘন্টা বেজে গেলেও সহজে সে স্কুল থেকে পালাত না। শিক্ষক মহাশয়গণ ও তাকে প্রভূত সাহায্য করত।

বর্তমান যুগের পরিস্থিতি হামিদকে চিন্তা মগ্ন করে তুলত। ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার হওয়ার যে স্বপ্ন, তা কি কোনো দিন বাস্তবায়িত হবে? উচ্চমাধ্যমিকের ফল ইতিমধ্যেই বেরিয়ে গেছে। এখন বাড়িতেই দিন কাটায় হামিদ। বিভিন্ন কলেজে ভর্তির ফর্মও জমা হল। হামিদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা দেখে তার স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ হামিদের মতো মেধাবী ছাত্রকে ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তারী পড়ার জন্য জয়েন্ট এন্ট্রাস পরীক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয় বিভিন্ন দপ্তরে দরখাস্ত পাঠিয়েছেন হামিদকে সাহায্য করার জন্য। দপ্তরগুলোও আশ্বাস যুগিয়েছেন হামিদকে সাহায্যের জন্য।

হামিদ এখন সারাদিন উঠোনে বসে কীসব সাত-পাঁচ ভাবে। হামিদের মতো সচ্চরিত্র, মেধাবী ও কর্মঠ ছেলেটির স্বাস্থ্যও দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। তার তা এখন খুশির সময়; কারণ, তার স্বপ্ন সফল হওয়ার একটা সুযোগ এসে গেছে। তবুও সে ভাবে।

তার এই ভাবনার একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে। একদিকে অভাবী সংসার, অন্যদিকে তার স্কুল জীবনের লুকোনো কাহিনী।

কয়েক বছর আগের কথা। তারই এক সহপাঠীর সঙ্গে তার ভাবের আদানপ্রদান শুরু হয়েছিল। এত অল্প বয়সে এসব কী? কোনো পাগলামী, বেয়াদপী, না প্রেম। ছাত্রীটির নাম সালমা, বাবার বিষয় সম্পত্তি অনেক। হামিদের সঙ্গে কোনদিনই সামঞ্জস্য হবেনা বলে সে তার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকত। হামিদের পরিবার অত্যন্ত গরিব। দুবেলা দুমুঠো খাবারের সংস্থান নেই। কিভাবে সে এই সব জিনিস মাথায় আনতে পারে?

কিন্তু মেয়েটির পাল্লায় পড়ে হামিদও কীসব দুঃশ্চিন্তা করতে লাগল। হামিদ গরিব দুঃখীর ছেলে। কেন ওর জীবনটা নষ্ট করতে চলেছে? অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে লেখাপড়া, হাসিঠাট্টা, আমোদ-প্রমোদ করলেও সালমার ব্যবহার নিজেকে অন্যরকম ভাবত। হামিদের মনে এখন নতুন নতুন ভাবের সঞ্চার।

স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগিতা চলাকালীন সালমা কত বাহ্বা দিত, উৎসাহিত করত। গ্রামের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দুজনার চোখা-চোখী হত। চার চোখের দৃষ্টিপাতে কী যে আনন্দ, কী যে সুখানুভূতি খুঁজে পেত, তা তাঁরা উপলব্ধী করতে পারত। হামিদও সালমার প্রতি প্রেমে নিমজ্জিত হল শেষ পর্যন্ত। এই ভাবে কতদিন কেটে গেল। এদিকে সালমা ক্রমশ বিবাহযোগ্য হয়ে উঠেছে। সালমার বাবা-মা তো নিশ্চয়ই তার বিবাহের প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিয়েছে। কিন্তু ,সালমা কি তার বাবা মায়ের মতে মতপোষণ করতে পারবে?

একদিন সালমা হামিদের সঙ্গে দেখা করে তাদের বিবাহের প্রস্তুতির কথা ব্যক্ত করে। কিন্তু হামিদ তাকে বাবা-মার কথা মেনে চলার জন্য বলে। সালমা জানায়, তাদের এত দিনের প্রণয় কে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারবে না। অবশেষে বহু কান্নাকাটি, বোঝাবুঝির পর তারা সিদ্ধান্ত নেয়, পরস্পরকে বিবাহ করবে। কথাও দিয়ে বসে। হামিদ জানায়, সে আগে নিজের পায়ে দাঁড়াবে, তার পর বিয়ে করবে।—এই হল হামিদ ও সালমার কিশোর বয়সের লুকোন প্রেমকথা।

জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা শেষ হল। ফলও বের হল। হামিদ জানতে পারল যে সে নাকি ভালো র‍্যাঙ্ক করেছে। এতে শিক্ষক মহাশয়গণ তো খুশি। হামিদের বাবা-মা, পাড়া-পড়শী সবাই আনন্দে উল্লসিত ।হামিদের ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্নও সফল হতে চলেছে।

মা-বাবাকে বিদায় জানিয়ে অবশেষে হামিদ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চলে গেল শহরের এক নামী কলেজে। হামিদ গ্রামের ছেলে। শহরের ব্যস্ত, ঘিঞ্জি পরিবেশে একদম হাঁপিয়ে উঠল। তবুও তাকে ইঞ্জিনিয়ারি পড়া শেষ করতেই হবে।

শহরে পড়াশোনার সময়েই হামিদ একটা চিঠি পেল। সালমা চিঠি পাঠিয়েছে। সে জানিয়েছে, শীঘ্রই তাকে উদ্ধার করতে। তার বাবা নাকি অন্য ছেলের সঙ্গে বিবাহ ঠিক করে ফেলেছে।

কী কুলক্ষণা মেয়ে, কেন যে হামিদের জীবনটা নষ্ট করতে উঠে পড়ে লেগেছে? হামিদের লেখা পড়ার ব্যাঘাত ঘটছে। রাতে ঘুম হচ্ছে কমকম, চিন্তা হচ্ছে বেশি। চিন্তায় হামিদের শরীর রোগা হয়ে পড়ল। কী করবে সে এখন? কোথায় যাবে?

এইভাবে একদিন সালমার বাবা সালমা ও হামিদের ব্যাপার জানতে পেরে মেয়ের বিয়ের দিন পর্যন্ত ঠিক করে ফেলল। হামিদ মা-বাবার কথা চিন্তা না ক'রে শেষ পর্যন্ত একটি মেয়ের প্রতি দুর্বলতাবশতঃ নিজের পায়েই কুড়ুল মারল।

বিয়ের দিন ঠিক হ'ল। বড়ো লোকের মেয়ের বিয়ে। বিয়েও হল ধুমধাম ঘটা করে।

হামিদ খবর পেয়ে কলেজের অনুমতি ছাড়াই দেওয়াল লাফিয়ে পালাল। চলল সব কিছু ত্যাগ করে। মনে মনে স্থির করে ফেলেছে; যে যদি সে সালমার বিবাহ থামাতে না পারে, অন্য কারও সঙ্গে যদি বিবাহ স্থির হয়ে যায়, তবে সে এ-জীবন আর রাখবেনা।

গভীর রাতে সালমাদের বাড়ির দরজায় এসে দেখল, ইতিমধ্যেই বিবাহ সমাপ্ত হয়ে গেছে। শ্বশুর ঘরে চলে গেছে সালমা। যাকে সে কথা দিয়েছিল, তার কথা একবারও ভাবল না। পকেটে ছিল পেলফস্ক, যেটা সে পথে আসার সময় বাজার থেকে কিনেছিল। বাবা-মায়ের মুখের দিকে না তাকিয়ে সেটা খেয়ে ফেলল সে।

সর্বনাশ। একি করল হামিদ শেষ পর্যন্ত একটা মেয়ের জন্য নিজের এবং বাবা-মায়ের স্বপ্নকে নিঃশেষ ক'রে ফেলল! চুরমার করে ফেলল সব!

কী জানি, কত বজ্জাত ঐ সমস্ত মেয়ের মন, কত নির্বোধ ঐ সব কিশোরদের মন। মা-বাবার আদর্শ, স্নেহ, ভালোবাসা, শিক্ষক মন্ডলীর সহানুভূতির, সব ধুলিসাৎ ক'রে ফেলল। একটুও ভাবল না তার দুঃখী মা-বাবার কথা!

একটি মেয়ে, যে এখন অন্যের ঘরনী, যে এখন অন্যকে গলা জড়িয়ে ধ'রে প্রেম ব্যক্ত করবে; তার জন্য হামিদ শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করে বসল। একী রকম লীলা খেলা। এ কীরকম ন্যায়-বিচার। এ কীরকম ন্যায় বিচার?

নিষ্ঠুর নিয়তি

মিনি চক্রবর্ত্তী

বাংলা (তৃতীয় বর্ষ)

সকালে ঘুম ভেঙে যেতেই ভাগ্যমাসির মনে পড়ে গেল যে, আজ রবিবার। রবিবার তাঁকে সকাল সকাল মঞ্জু দিদিমণির বাড়িতে যেতে হয়। তাই সে তাড়াতাড়ি বাড়ির সব কাজ সামলে নিয়ে, নাতিটাকে খাইয়ে দিয়ে, বৌমাকে সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে বেড়িয়ে পড়ল। বেশি দূর নয়, প্রায় ১৫ মিনিট পায়ে হেঁটেই মঞ্জুদিদির বাড়িতে পৌঁছে যাওয়া যায়। মঞ্জুদিদিমণি বরানগর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। বরানগরে স্কুলের কাছেই একটা ভাড়া বাড়িতে থাকে এবং রবিবার সে তার নিজের বাড়িতে মা-বাবার কাছে যায়। সেখানে পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে আনন্দে কাটিয়ে আবার সোমবার বরানগরে ফিরে আসে। তাই ভাগ্যশ্রীকে রবিবার দিদিমণির বেরিয়ে যাওয়ার আগেই সকালে এসে ঘর-দোর সব মুছে, পরিষ্কার করে, বাসন-কোসন ধুয়ে দিতে হয়।

প্রতিদিনের মতো এদিনও ভাগ্যশ্রী তাই মঞ্জুদিদিমণির বাড়িতে ঠিক সময় মতো হাজির। কিন্তু ভাগ্যশ্রী দেখল যে, দিদিমণির বাড়ি যাওয়ার কোনো তাড়া নেই এবং দিদিমণি হাতে চায়ের কাপ নিয়ে জানালার রেলিং - এর ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে উদাস ভাবে চেয়ে আছে। তার চোখদুটো রাঙা হয়ে আছে। ভাগ্যশ্রী তিন বছর হল মঞ্জুদিদির বাড়িতে কাজ করছে এবং তাই মেয়ের বয়সী মঞ্জুর প্রতি তার একটা টান তৈরী হয়েছে। তাই সে মঞ্জুকে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল — "কী গো দিদিমণি, তুমি আজ বাড়ি যাবে না?" কিন্তু দিদিমণি শুনতেই পেলনা। সে যেন ভাবনার অন্য জগতে চলে গেছে।

ভাগ্যশ্রী এবার তার কাছে গিয়ে তাকে আবার জিজ্ঞাসা করল- "দিদিমণি তোমার শরীর ভালো আছে তো?"

এবার মঞ্জুদিদিমণির চমক ভাঙল। প্রথমটায় কিছু না বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও। পরে সে ভাগ্যমাসির জেদাজেদীতে কান্না ভেজা গলায় বলল যে, সে এক আত্মীয়ের কাছে জানতে পেরেছে যে, এতদিন যাদের সে বাবা-মা বলে জেনে এসেছে তারা তাঁর আসল বাবা-মা নয়। মঞ্জুর যখন তিন বছর বয়স তখন সেই দম্পতি তাকে একটি অনাথ আশ্রাম থেকে দত্তক নিয়েছিলেন। মঞ্জু যেই অনাথ আশ্রমে গিয়েও ছিল কথাটা সত্য না মিথ্যা জানার জন্য। সে জানতে পেরেছে, সত্যিই মঞ্জু তাদের সন্তান নয়। মঞ্জুর আসল বাবা-মা কে তা কেউই জানে না। এই ব'লে মঞ্জু ফুপিয়ে ফুপিয়ে মাসিকে জড়িয়ে ধরে আবার কান্না শুরু করল।

ভাগ্যমাসি তার কন্যাতুল্য মঞ্জুর কথা শুনে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল— "দিদিমণি তোমার জীবনে ভগবান তাও অনেক সুখ দিয়েছেন। তুমি নিজের বাবা-মায়ের কাছে না থাকতে পেলেও ভগবান তোমাকে আরেক বাবা-মা দিয়েছেন, যাঁরা তোমাকে নিজের সন্তানের মতো মানুষ করেছে এবং নিজেদের স্নেহ, ভালোবাসা, মমতা দিয়ে বড়ো করে তুলেছেন। তাদের জন্যই তুমি নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরী পেয়েছো।"

মঞ্জু দিদিমণিকে এই কথাগুলো বলতে বলতে নিজের জীবনের কথাও তার মনে পড়ে গেল। এবং সে তার জীবনের কথা মঞ্জু দিদিমণিকে বলতে শুরু করল।

সে প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। ভাগ্যশ্রী তার বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। যখন তাঁর জন্ম হয় তখন তাদের আর্থিক অবস্থাও ভালো। শখ করে আর বাবা হরিপদ মেয়ের নাম রেখেছিল 'ভাগ্যশ্রী'। কিন্তু সেই নাম শুনে বিধাতাপুরুষ হয়তো অলক্ষ্যে হেসেছিলেন। ভাগ্যশ্রীর যখন পাঁচ বছর তখন তার বাবা-মা দু'জনেই বাস দুর্ঘটনায় মারা যায়। এরপর থেকে ভাগ্যশ্রীর ভাগ্যে নেমে এসেছিল নিষ্ঠুর নিয়তির খেলা। মঞ্জুদিদিমণির মতো তাকে কোনো দম্পতি দত্তক নেয় নি, বা তার কোনো আত্মীয়ও তাকে আশ্রয় দেয়নি। তাই ছোটো বয়স তেকেই তাকে পরের ঘরে কাজ করে, তাদের ফাই-ফরমাশ খেটে

পেটের ভাত জোগাড় করতে হত। তারপর ভাগ্যশ্রীর বয়স যখন ১৭-১৮ তখন তার সঙ্গে এক রাজমিস্ত্রির বিয়েও হয়। কিন্তু স্বামীর সঙ্গেও সে বেশীদিন সুখে থাকতে পারলনা। কারণ তার স্বামীও মারা গেল - একটা নতুন নির্মীয়মান পাকা বাড়ি চাপা পড়ে। কিন্তু ততদিনে তার একটা সন্তানও হয়ে গিয়েছে। তাই সেই সন্তানকে মানুষ করতে সে আবার পরের ঘরে, ঘরে কাজ করতে শুরু করে। এইভাবেই ভাগ্যশ্রী থেকে সে 'ভাগ্যমাসি'তে পরিণত হয়।

মঞ্জুদিদিমণি ভাগ্যমাসির জীবনের এইসব কথা শুনে বুঝতে পারল যে, তার থেকেও এই পৃথিবীতে অনেক দুঃখী মানুষ আছে। যাঁরা আশ্রয়হীনভাবে সহায়-সম্বলহীনভাবে বেঁচে থাকার জন্য তাদের কঠোর জীবন-সংগ্রাম করতে হয়। কিন্তু তাকে তো তেমন ভাবে সংগ্রাম করে বাঁচতে হয়নি। তার পালক মা-বাবা তাকে যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যে রেখে মানুষ করেছে। তাই, ভাগ্যমাসি যখন তাকে তার পালক মা-বাবার কাছে যেতে বলে, তখন সে যেতে রাজি হয়। এবং তাদেরকেই নিজের বাবা-মা বলে মেনে নেয়। আর ভাগ্যমাসিকেও আরো বেশি ক'রে আপনার জন ভাবতে থাকে।

শান্তিনিকেতনে 'খোয়াই' দেখতে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা।

সে কে?

অমিত পণ্ডিত
বাংলা (দ্বিতীয় বর্ষ)

সেদিনও বিকেল বেলায় প্রশান্ত খেলার মাঠে যায়; সবার সঙ্গে খেলার ইচ্ছা ওর হল না। তাই মাঠের এক প্রান্তে একটি আম গাছের নীচে বসে কী যেন এক মনে ভাবতে লাগল। বন্ধুরা তাকে খেলতে না দেখে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী রে প্রশান্ত বসে আছিস কেন? চল খেলবি চল চল........। প্রশান্ত তাদের বলে, রোজ রোজ একই খেলা খেলতে ভালো লাগে না। তার পর সকল বন্ধু সহ প্রশান্ত ঠিক করল আজকে আর খেলব না। আজকে তারা ঘুরতে যাবে নদীর ওপারে, কিন্তু ওপারে কেউ যায় না, আর এপার থেকে কেবল বড় বড় গাছ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। তারা সকলেই নদীতে হাটু পর্যন্ত জল পার করে সেই ঘন বনে প্রবেশ করে।

এদের মধ্যেই এক বন্ধু রিজু হঠাৎ বলে, ভয় লাগছে আর এদিকে না যেয়ে বাড়ি য়াওয়াই ভালো। এই মতো তারা সকলে একমত না হওয়ায় কেউ আর বাড়ির দিকে গেল না। কিছুটা এগিয়ে যেতেই দেখে, হঠাৎই তাদের বন্ধু রিজু আর তাদের সঙ্গে নেই। হয়তো সে দল ছাড়া হয়ে পড়েছে। প্রশান্ত তাদের বলে, ভয় নেই, আমরা যেই রাস্তা দিয়ে এসেছি, সেই রাস্তা ধরে গেলেই রিজুকে পেয়ে যাব। সকল বন্ধুরা একটি বন্ধুকে হারিয়ে ভয়ে প্রায় কাঁদ কাঁদ অবস্থায় পৌঁছে গেছে। এমন সকল অবস্থা দেখে প্রশান্ত কিন্তু ভেঙে পড়েনি; বরং সে তার বন্ধুদের এক সাথে নিয়ে বনেই ঘোরাফেরা করছে।

সূর্য হয়তো ডুবার সময় নিকট আসছে। তাই এবার বনের ভিতরটা অন্ধকার হয়ে আসছে। আর তাদের একবন্ধু এখনো সঙ্গীহীন, একা হয়ে পড়েছে; তার চিন্তাই সকলকে আরও বেশী ভীত করছে। তারা সেই বনে হঠাৎ এক ছোট মিষ্টি মেয়েকে দেখতে পায়। সে তাদেরকে দেখে খুব হাসছে আর বার বার জিজ্ঞাসা করছে, 'তোমরা কারা... এখানে এসেছো কি আমার সাথে খেলা করার জন্য।'

উত্তরে অন্যরা কেউ কিছু না বললেও প্রশান্ত ব... না.. না... আমরা তোমার সাথে খেলতে নয়, বরং ... ছেড়ে আমরা এই বনে ঘুরতে এসেছি; আর আমা... এক বন্ধু দল ছাড়া হয়ে গিয়েছে; তাকেই আমরা খুঁজ... কিন্তু তুমি কে?

মেয়েটি হাসতে হাসতে বলে, 'আমি এই ব... থাকি। আমাকে তোমাদের বন্ধু করবে? তাহলে ... তোমাদের বন্ধুকে খুঁজে দেব। আমি এই বনের স... রাস্তা চিনি। এই বনের সকল পথই আমার জানা ... প্রশান্ত সহ সকল বন্ধু সেই মেয়েটির সঙ্গে রিজু... খুঁজতে লাগল। বনের মধ্যে সেই মেয়েটি কেবল ... কথা বলতে থাকে তাদের সকলকে; যাদের মধ্যে ... প্রশান্ত তার কথা হয়ত শুনছিল। আর তার সমস্ত প্র... উত্তর দিচ্ছিল।

এই ভাবেই প্রশান্ত সেই রিজুকে হঠাৎই বনের ম... খুঁজে পায়। আর তাকে পাওয়া মাত্রই তার সঙ্গে ... মেয়েটি ছিল সে যেন হঠাৎই নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। ... দিকে কেউ লক্ষ্য না ক'রে সকলে রিজুর সঙ্গে নানা প্র... করতে লাগে। সব প্রশ্নের উত্তরে রিজু জানায়, তা... হঠাৎ এক মেয়ে এই বনের মধ্যে দেখতে পেয়ে ... দেয়। আর সে তার ডাকেই ছুয়ে যায়। মেয়েটি ... খুব ছোট মিষ্টি ও সুন্দরী। এই কথা বলা মাত্রই প্রশা... তার পাশে দেখতে পায় সেই মেয়েটি আর নেই। এ... সামনেই নদী। সূর্য্য ডুবে গিয়েছে। তারা সকলেই আবা... নদী পেরিয়ে তাদের বাড়ি চলে যায়।

সকলে তাদের বাড়ি গিয়ে সেই বনের কথা ভুলে... যায়। কিন্তু প্রশান্ত শুধু সেই ছোট মেয়েটির কথা ভাবছে... এই ভাবেই রাত হয়ে যায়। প্রশান্ত ঘুমিয়ে পড়ে। কিছুক্ষ... পর প্রশান্ত স্বপ্নে সেই মেয়েটিকে দেখতে পায়, মেয়েটি... তাকে প্রশ্ন করে, প্রশান্ত আমার কোনো বন্ধু নেই, তুমি... কী আমার বন্ধু হবে? প্রশান্ত তাকে কিছু না বললেও...

সেই মেয়েটি বার বার তাকে একই প্রশ্ন করে। প্রশান্ত আবার, তাকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কে? কে, কে তুমি? তুমি তখন হঠাৎ কোথায় চলে গেলে কিছু না বলে? মেয়েটি তাকে বলে, সে যদি তাকে তার বন্ধু করে তাহলে মেয়েটি বলবে, সে কে?

একথা বলার পরই প্রশান্তর হঠাৎ ঘুম ভাঙে, আর সে বিছানায় চমকে উঠে দেখে তাকে স্বপ্নেও সেই মেয়েটি দেখা দিয়েছে? সে কে?

শান্তিনিকেতনে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বনভোজন।

স্পেশাল ক্যাম্পে এন.এস.এস.-এর সাফাই কর্ম।

ডাক্তার

অমৃত পাল
সংস্কৃত (দ্বিতীয় বর্ষ)

আজ থেকে প্রায় তেরো বছর আগে, তারিখটা ছিল ৪ঠা জুলাই, ২০০২ সাল। উজির পুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নন্দলাল ভৌমিক তার সহকর্মীদের নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে ঐ বিদ্যালয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম তিন জন ছাত্রের ফলাফল জানাচ্ছেন। তবে এ বছরের ফলাফলে তিনি যেন একটু বেশী আনন্দিত ও গর্বিত। কারণ সমস্ত বছরের রেজাল্টের তুলনায় এ বছরের রেজাল্ট উৎকৃষ্ট। সবাই যখন আগ্রহের সঙ্গে রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করছে ঠিক সেই মুহুর্তে নন্দলাল মহাশয় ঘোষণা করলেন, ' এবছরে উজিরপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ৯২% নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান পেয়েছে সৌরভ রায়। এর পরে যথাক্রমে ৮৯% নম্বর পেয়ে সুকমার মণ্ডল দ্বিতীয় স্থান এবং ৮৬% নম্বর পেয়ে ইমাম সেখ তৃতীয় স্থান পেয়েছে। এই চরম আনন্দের মুহূর্তে হাত তালির সঙ্গে সঙ্গে সৌরভের ছোখ দুটি জলে ভরে গেল। কিন্তু, সকলেরই একটাই জিজ্ঞাসা, এত ভালো রেজাল্ট হওয়া সত্ত্বেও চোখের জলের কারণ কী?

এবারে সৌরভের পরিবারের পরিচয় দিই। সৌরভ একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তার পিতার নাম বিজয় রায়। তিনি উজির পুর গ্রামের পোষ্ট অফিসের পোষ্ট মাস্টার। সংসারে সামান্য অর্থের অভাব হ'লেও সুখেই কেটে যাচ্ছিল তাদের জীবন। কিন্তু, বিধাতার এ সুখ আর সহ্য হল না। তাই, মাস খানেক আগে ডাক্তারি পরীক্ষায় তার বাবার একটা বড়ো অসুখ ধরা পড়েছে। ডাক্তার বলেছেন, একটা অপারেশন করালে হয়তো সেরে যাবে, সৌরভের মায়ের সমস্ত গয়না বিক্রয় করেও অপারেশনের জন্য এত টাকা জোগাড় করতে পারেনি। আজ ইস্কুলে যাবার সময় সৌরভ তার বাবাকে একটু বেশী অসুস্থ অনুভব করতে দেখে গেছে। হয়তো চোখের জলের কারণ এটাই ছিল।

সৌরভ Mark Sheet এবং Certificate নিয়ে বাড়ি ফিরতেই লোকজন দেখে ঘাবড়ে যায়। ধীরে ধীরে বারান্দার দিকে গিয়ে দেখল, তার বাবা শুয়ে আছে পাশে বসে তার মা কাঁদছে। সৌরভ তার বাবার পায়ের কাছে বসতেই তাকে কাছে টেনে নিয়ে তার বাবা তাকে মৃদু কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞেস করলেন - 'কীরে সৌরভ কাঁদছিস কেন? পাশ করেছিস তো? তোর Marksheet টা দেখ দেখি। তার রেজাল্ট দেখে খুশি হলেন এবং হাসলেন।

এটাই ছিল তার জীবনের শেষ হাসি। তিনি মারা গেলেন। সৌরভের জীবনে নেমে এল ঘোর অন্ধকার। এখন কী করবে সৌরভ?

পিতাকে দাহ করতে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল। এদিকে স্বামী-স্ত্রীর অকৃত্রিম ভালোবাসা ছিন্ন করে চলে যাওয়ার যন্ত্রণা সহ্য না করতে পেরে সৌরভের মা চোখ বুজলেন। তারপর আর কোনো দিন চোখ খোলেননি। সৌরভ তার পিতা-মাতার মুখে আগুন দিয়ে তাদেরকে শেষ বিদায় জানালেন। গ্রীষ্মের দুপুরে উজ্জ্বল পরিষ্কার সমস্ত আকাশকে চিতার ধোঁয়ার যেন ক্ষণকালের জন্য গ্রাস করল। সে তার পিতা-মাতার চিতা ছুঁয়ে শপথ করলে, যে-ভাবে অর্থের অভাবে চিকিৎসা না করাতে পেরে মা, বাবাকে হারালেন সে এ ভাবে গ্রামের আর কোনো ছেলে মেয়েকে পিতৃহীন হতে দেবেনা। সে ডাক্তার হবেই হবে।

কিন্তু কিভাবে?

সৌরভ এখন তিন দিন ধরে উপোস। ঘরে একমুঠোও খাবার নেই। এ বিশাল পৃথিবীতে সে যেন একা। এ সময় তার একমাত্র সাথী হ'ল চোখের জল। পেটের খিদের যন্ত্রনা সহ্য না করতে পেরে তার ক্লাস মেট সুকুমারের মায়ের কাছে কিছু খাবার চাইল। তার মা সৌরভের মাথায় হাত বুলিয়ে, সান্ত্বনা দিয়ে ভাত খেতে দিল। কিন্তু বিধাতার পরিহাসে সেখানে সুকুমার এসে গেল। তার জন্যই স্কুলে প্রথম হতে পারেনি এ কথা ভেবে প্রতিশোধ

নিতে ভাতের থালায় লাথি মেরে ফেলে দিলো। সৌরভ অপমানিত হয়ে চলে গেল।

সারারাত পিতা-মাতাকে হারানো ও ক্ষুধার তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে শহরে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিল। পরের দিন রেলস্টেশনের দিকে রওনা হল। যাবার সময় সে আবার একবার তার জন্মভূমির ইস্কুল, খেলার মাঠ, রাস্তাঘাটের দিকে তাকালো। আজ তারাও যেন সৌরভের দুঃখে দুঃখী। কিন্তু, উপায় নেই. সে নিরুপায় হয়ে নিজের আত্মাকে যেন গ্রামে রেখে শুধু শরীরটা নিয়ে শহরের দিকে রওনা হল।

সৌরভ কলকাতায় এল। সেখানে ভাগ্যক্রমে একজন দোকান মালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সৌরভ তাকে একটা কাজ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। এভাবেই কিছু দিন চলে গেল। তারপর একদিন সৌরভের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'ল। নিঃসন্তান দোকান মালিকের চোখে তার দুর্দান্ত রেজাল্ট ধরা পড়ল। তখন নিঃসন্তান দোকানদার তাকে পুত্র রূপে গ্রহণ করতে চাইলেন। এবং সৌরভকে তার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য জানতে চাইলেন। তখন সৌরভ একজন ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সৌরভকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির সুযোগ করে দিলেন।

সাত-আট বছরে একজন ভালো ডাক্তার হয়ে উঠল। আজ সে কলকাতার প্রথম একটা বড়ো অপারেশন করবে।

অন্যদিকে, সুকুমারের অনেক অধঃপতন ঘটে। সে মদ, জুয়া এবং বিভিন্ন নেশায় মত্ত হয়ে B.Sc তে ভালো রেজাল্ট করতে পারেনি। একদিন সে মদ্যপান করে রাস্তা পার হবা সময় গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়। তার অবস্থা খুব খারাপ হওয়ায় কলকাতায় ট্রান্সফার করা হয়। এর পর ডাঃ এস. রায় এর হাতে অ্যাডমিড হয়। অনেক যত্ন সহকারে ডাঃ এস. রায় তার প্রথম অপারেশনে সফল হয়। এরপর ডাঃ এস. রায় জিজ্ঞেসা করলো 'কিরে, সুকুমার, কেমন আছিস এখন?' সুকুমার বিষ্ময়ে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে 'ডাক্তারবাবু, আপনি আমার নাম জানলেন কিভাবে?

সৌরভ নিজের পরিচয় দিলে তার বন্ধুত্বকে আবার স্বীকার করে নেয়।

এবার সুকুমারের সমস্ত অর্থের অহংকার চুর্ণ হয়ে যায়। যাকে একদিন ক্ষুধার্ত অবস্থায় ভাতের থালা কেড়ে নিয়েছিলো, সেই আজ তার প্রাণ বাঁচিয়েছে, — এ কথা ভেবে লজ্জায় ও নিজের প্রতি ঘৃণায় আর কোনো উত্তর করলো না।

প্রজাতন্ত্র দিবসে কলেজের এন.সি.সি.।

মজিবরের মেয়ে

মফিজুল সেখ

বি.এ. (প্রথম বর্ষ)

মজিবরের স্বপ্ন ছিল, সে তার ছেলেকে অনেক উচ্চ াস পর্যন্ত পড়াবে। মজিবরের বাড়ি ছিল একটি ছোটো ামে। বাবার অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভালো না থাকার ন্য তাঁর লেখাপড়া করা হয়নি। তাকে অল্প বয়সেই নমে যেতে হয় চাষের কাজে। মজিবরের খুবই রাগ ছিল ার বাবার উপরে; কারণ, তার বাবার জন্য তার লখাপড়া করা হয়নি। খুবই ইচ্ছে ছিল তার, লেখাপড়া রার। কিন্তু তার ইচ্ছে পূরণ হয়নি। তাই, সে ভেবেছিল, মামি লেখাপড়া করতে পারিনি তো কী হয়েছে, আমার ছলেকে আমি মানুষের মতো মানুষ করে তুলব।

এই পরিস্থিতিতেই মজিবরের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল অল্প বয়সেই। মজিবর একটি শিক্ষিত মেয়েকে বিয়ে করেছিল। যদিও মেয়েটি ছিল তার গ্রামেরই। অনেকে বলত, তারা নাকি ভালোবেসে বিয়ে করেছে।

মজিবর মনে মনে চিন্তা করল, আমার বাবা আমাকে পড়াতে পারেনি, তাই আমি তার উপরে যেমন রাগ করে আছি, তেমন আমার ছেলে যেন আমার উপরে রাগ করতে না পারে। তাই সে তার কোনো সন্তান জন্মানোর আগে থেকেই টাকা পয়সা সঞ্চয় করতে লাগল।

কিন্তু সময়কালে দেখা গেল, তার কোনো পুত্র সন্তান নয়, দুটোই মেয়ে জন্ম নিল। মজিবর তাঁর বড় মেয়ের নাম রাখল সাহানাজ এবং ছোটো মেয়ের নাম সুহানি। মজিবর যদিও ছেলের 'স্বপ্ন' দেখেছিল, কিন্তু তার ছেলে না হয়ে দুটোই মেয়ে হল; তবুও সে, তার মেয়েকে খারাপ চোখে দেখেনি। মজিবর খুবই ভালোবাসত তার মেয়েদের। তাই সে ছেলের জন্য যে টাকা জমা করেছিল, সেগুলি খরচা করতে লাগল মেয়েদের পিছনে। মজিবরের ভাবনা, আমার ছেলে হয়নি তো কি হয়েছে, আমি আমার মেয়েকে অনেক দূর পর্যন্ত পড়াবো। মজিবরের দ্বিতীয় মেয়েটি ছিল অনেক ছোটো, যখন সাহানাজকে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করা হল তখন জন্ম হয় সুহানির।

মজিবর অনেক আশা নিয়ে পড়াতে শুরু করল তার মেয়ে সাহানাজকে। ধীরে ধীরে সাহানাজ বড় হয়ে উঠলো। গ্রামের প্রাইমারি স্কুল থেকে হাই স্কুলে উঠে গেল। মজিবর তার মেয়েকে খুবই ভালোবাসত। তাই হাই স্কুলে যাওয়ার জন্য তাকে একটা সাইকেল কিনে দিল।

সাহানাজের বয়স যখন খুবই কম ছিল, তখন থেকেই মজিবরের ইচ্ছে ছিল তার মেয়েকে ডাক্তারি পড়ানোর। কিন্তু সাহানাজের ইচ্ছে ছিল শিক্ষিকা হওয়ার। কিন্তু সে তার বাবাকে খুবই সম্মান করত। তাই তার মুখের উপর না করতে পারল না। তাঁর বাবা দুঃখ পাবে ব'লে।

সবকিছু ভালো ভাবেই চলছিল, আর সাহানাজের পড়াও ভালোভাবেই হচ্ছিল কিন্তু সে যত উচ্চ ক্লাসে উঠতে লাগল, তার লেখাপড়াও কমতে লাগল। সাহানাজের সাথেই তার একটা বান্ধবী পড়ত দিয়া নামের। তাদের দুজনের মধ্যে খুবই বন্ধুত্ব। সাহানাজ প্রায়ই দিয়াদের বাড়ি যেত, একই সঙ্গে ঘুরে বেড়াত, এবং একসাথেই স্কুলে যেত। মাঝে মাঝে সে দিয়াদের বাড়ি যেত এবং অনেক সময় কাটিয়ে আসত। দিয়ার একটি ভাই ছিল, দীপু, দিয়াদের বাড়ি ঘন ঘন যাওয়ার জন্যই দীপুর সঙ্গে সাহানাজের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যায়, আর এই ঘনিষ্ঠতাই পরিনত হয় ভালোবাসায়। ওদের দুজনের মধ্যে বেশ ভালোবাসা চলতে থাকে, আর এদিকে মজিবর ভাবছে তার মেয়ে খুবই পড়াশোনা করছে।

একদিন যখন মজিবর তার মেয়েকে বলেছিল ডাক্তারি পড়ার জন্য, তখন সে তার বাবার মুখের উপর উত্তর দিয়েছিল যে সে ডাক্তার নয় শিক্ষিকা হ'তে চায়। মজিবর তার মেয়েকে কিছু বলেনি সেদিন, শুধু বলেছিল তোর যেটা ইচ্ছে হবে, তুই সেটাই করবি।

মজিবর বেশ বুজতে পারল যে, তার মেয়ের বয়স হয়েছে এবং বিবাহের জন্য পাত্র খুঁজতে হবে।

সাহানাজ বেশ বড়ো হয়ে গেল। হাই স্কুল থেকে

কলেজে উঠে গেল। সাহানাজ কলেজের নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ত। কিন্তু সে কলেজে না গিয়ে দীপুর সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। আর মজিবর ভাবছে তার মেয়ে আছে কলেজে আর সে খুবই লেখাপড়া করছে।

সাহানাজকে একদিন তার মা ও বাবা তার বিয়ের কথা বলল। কিন্তু বিয়ের কথা শুনেই সাহানাজ তার বাবা-মাকে বলে, সে যদি বিয়ে করে, তো শুধু দীপুকেই করবে, আর কাউকে না। মজিবরও রেগে গিয়ে বলে যে, আমি তোর বিয়ে যেখানে দেব, তোকে সেখানেই বিয়ে করতে হবে। সাহানাজ কিছু বলল না, শুধু সে ঘরে চলে গেল। আর ভোর বেলায় উঠে সে পালিয়ে গেল দীপুর সঙ্গে।

সকাল বেলায় সারা পাড়ায় হই চই শুরু হয়ে গেল, মজিবরের মেয়ে কোনো ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। সেদিন থেকে মজিবর বাইরে বেরোতে পারত না। আর সে বাইরে বেরোলেই পাড়ার লোকে ছিঃ ছিঃ করত। বলত, যে লোক নিজের মেয়েকে সামলে রাখতে পারেনা তার মরে যাওয়াই ভালো।

মজিবরের রাত্রে ঘুম আসেনা এবং ঘুমোতে গেলেই মনে পড়ে, গ্রামের লোকের 'কটু কথা'। মজিবর ভাবলো, যে এই ভাবে প্রতিদিন মরার চেয়ে একবার মরাই ভালো। তাই, সেই রাতেই মজিবর গলায় দড়ি দিয়ে মৃত্যু বরণ করল। তার মেয়ের পাপের জন্য তাকে প্রাণের বলি দিতে হল। সাহানাজ তার বাবার মৃত্যুর খবর শুনেও আসতে পারেনি। সে বুজতে পেরেছিল, সে যদি গ্রামে যায় তবে গ্রামের লোক তাকে ছাড়বে না এবং সে তার গ্রামে মুখ দেখাতেও পারবেনা।

সাহানাজের সঙ্গে তার স্বামীর সংসার তিন-চার মাস বেশ ভালোই কাটল। তাঁর পর থেকে তাদের দুজনের মধ্যে নানা কারণে ঝগড়া বাধে, মারামারি হয়। সাহানাজ বলে তার স্বামীকে, কোথায় গেল তোমার সেই ভালোবাসা? সেই সুখের গান? তখন দীপু জবাব দেয় তুই দুর হয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে। তোকে আর ভালো লাগেনা, সহ্য হয় না আমার।

সাহানাজ চিন্তা করল, সে যদি তার বাবার কথা শুনতো তবে তার এই দশা হত না। তার বাবাকেও মরতে হত না। সাহানাজ তাঁর প্রতিদিনের ঝগড়া-ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবার জন্য চলে এলো তাঁর স্বামীর ঘর ছেড়ে। কিন্তু, সে যাবে কোথায়? তার বাবার বাড়িতেও তার আশ্রয় হবে না। এবং সে দীপুর কাছেও যেতে পারবে না। সে দীপুর কাছ থেকে চলে এসে কোথায় যাবে, তার পথ পেল না।

সাহানাজ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে হাঁটিতে হাঁটিতে চলে আসে সেই সমুদ্রের ধারে, যেখান দীপু এবং সাহানাজ বেড়াতে আসত বিবাহের আগে। গান গাইত প্রেমের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে। আজ সে কোথায় যাবে তার পথ না পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রের জলে এবং মৃত্যুবরণ করল।

রবীন্দ্রনাথের উপর আলোচনা সভায় ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

হাজিরা

ড. রঞ্জিৎ কুমার সরকার
সহযোগী অধ্যাপক (অর্থনীতি)

।। ১ ।।

সাইকেলের প্যাডেলে জোরে চাপ দেয় পলাশ। নাঃ, ন'টা দশের বাসটা বোধহয় আজ আর পাওয়া যাবে না। সকালে ঘুম থেকে উঠতে আজ একটুকু দেরী হয়েছিল। তার উপর বেরুবার মুখেই পাড়ার দুটো ছেলে পাড়ার কিছু সমস্যা নিয়ে হাজির। তুপাকে বারণ করে দেওয়া সত্ত্বেও বিদায় দিয়ে বাড়ী থেকে বেরুতেই ন'টা বেজে গেল। বাড়ী থেকে সাইকেলে বাসস্ট্যান্ডে আসতে মিনিট কুড়ি লাগে। সাইকেল গ্যারাজে সাইকেল রেখে বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে ঘড়ি দেখল পলাশ ন'টা কুড়ি বেজে গেছে। খোঁজ নিয়ে জানল ন'টা দশের বাস ঠিক সময়েই চলে গেছে। অগত্যা পরের বাসের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। পরের বাস ন'টা পঞ্চাশ মিনিটে। যাত্রীদের জন্য বিশ্রামাগারের বেঞ্চে বসে পড়ল পলাশ।

পলাশ চৌধুরী নবনালন্দা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইংরাজীর শিক্ষক। শ্রীখণ্ড জেলার সদর শহর শালবনী থেকে উত্তরদিকে প্রায় ৭০ কি.মি. দূরে ৬২ নং জাতীয় সড়কের ধারে নবনালন্দা, শহরের একমাত্র উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। স্বামী, স্ত্রী এবং একমাত্র সন্তান তিয়াসকে নিয়ে পলাশের সংসার। বছর পনোরো আগে পলাশ যখন ঐ বিদ্যালয়ে যোগ দেয় তখন নবনালন্দা ছিল পঞ্চায়েতের অধীনে একটি গ্রাম। বর্তমানে নবনালন্দা পৌরসভা হয়েছে। প্রথম যখন ঐ স্কুলে যোগ দেয় তখন স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩০০ জনের মত। বর্তমানে ছাত্রসংখ্যা বেড়ে প্রায় ৩২০০ জন। স্কুলের পরিকাঠামো এবং শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীও এখন অনেক বেশী। পলাশ যখন প্রথম যোগ দেয়, তখন নিত্যদিন এই বাসযাত্রা সম্ভব হবে না ভেবে নবনালন্দায় বাড়ীভাড়াও নিয়েছিল কিছুদিন। বাস ছাড়া ট্রেনের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ শালবনী থেকে নবনালন্দার নেই। তাই নিত্যদিন বাসে অন্তত দু'ঘন্টা করে প্রায় চার ঘন্টার যাতায়াত। আর স্কুলে কাটে পাঁচঘন্টা। কিন্তু হঠাৎ পলাশের মা পক্ষাঘাত রো আক্রান্ত হওয়ায় প্রাণে বেঁচে গেলেও ডানদিকটা অক হয়ে হাঁটাচলার ক্ষমতা লোপ পায়। ফলে পলাশকে বা হয়ে নবনালন্দার বাড়ীভাড়া ছেড়ে দিয়ে যাতাযাত করতে হয়।

এমনিভাবে বছর পনেরো কাটিয়ে দিল পলাশ। কি বর্তমানে যিনি প্রধান শিক্ষক হয়ে এসেছেন তিনি খু কড়া। অবিবাহিতা তিনি, সংসারের কোন ঝামেলা নেই স্কুল ছুটি থাকলে তাঁর খুব মুশকিল, সময়ই নাকি কাটতে চায়না। এগারোটার আগে স্কুলে আসেন, পাঁচটার পরে বাড়ী যান। কোথাও বেড়াতে বা হাওয়া বদলাতে যা না। বেড়াতে যাওয়া নাকি তাঁর কাছে বিলাসিতা ছাড় আর কিছু নয়। স্কুলে তিনি যে খুব একটা কাজে ব্যস্ত থাকেন তা নয়, কিন্তু তাঁর কাছে গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হ'ল স্কুলে ঠিক সময়ে হাজিরা দেওয়া, ক্লাস ঠিকমত হোক বা না হোকদিনে পাঁচঘন্টা স্কুলে থেকে তবে বাড়ী যাওয়া। মোদ্দাকথা, স্কুলে হাজিরাটাই তাঁর কাছে প্রধান বিষয়, অন্য ব্যাপারগুলো গৌণ। আর ছুটিছাটা নিলেই তিনি রেগে ওঠেন এবং দরখাস্ত শেষ পর্যন্ত মঞ্জুর করলেও দু'চারটে কথা শুনিয়ে তারপর। এবং সেক্ষেত্রে দু'একটা অশ্লীল বাক্য বলতেও তাঁর আটকায় না।

বেঞ্চে বসে এইসব ভাবতে ভাবতে অতীত স্মৃতি রোমন্থন করছিল পলাশ। হঠাৎ দৈনিক সহযাত্রী অরিন্দমের ডাকে চমক ভাঙে তার। "স্যার, ন'টা পঞ্চাশ এর বাস ঢুকছে"। বাস ডিপোতে ঢোকামাত্র পলাশ উঠে গিয়ে বাসে উঠে একেবারে শেষের দিকে কোনরকমে একটা বসার জায়গা পেয়ে যায়। বাস চলতে শুরু করে গন্তব্যস্থলের দিকে।

স্কুলে পৌঁছাতে পৌঁছাতে ১১টা ২০ মিনিট হয়ে গেল। আজ যদিও তার প্রথম পিরিয়ডে ক্লাসনেই, তবুও প্রধান শিক্ষক মহাশয় গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "পলাশ,

আজও দেরী করলে। বাড়ী থেকে আরও আগে বেরুতে পারনা। এরকম হলে আমি কিন্তু M.C. -এর মিটিংএ ব্যাপারটা তুলব"। বিরক্তমুখে মিনমিনে গলায় পলাশ বলল, "হ্যাঁ স্যার, আগের বাসটা মিস্ করায় একটু দেরী হয়ে গেল"। বলেই দোতালায় স্টাফরুমের দিকে সিঁড়িতে উঠে গেল।

।। ২।।

মাসখানেক পরের ঘটনা। সেদিন রাত্রি থেকেই হঠাৎ তিয়াসের ভীষণ জ্বর, সর্দ্দিকাশি, বমি। তৃণাও বেশ বিচলিত হয়ে ডাক্তারকাকুকে ফোন করল। কিন্তু ফোন switched off। বাধ্যহয়ে নিজেরাই জলপট্টি দিতে লাগলো, জ্বরের ট্যাবলেট গুলে খাওয়ালো। ভোররাত্রের দিকে জ্বরটা একটু কমে, তিয়াস একটু ঘুমুতে লাগলো। পলাশ স্কুলে যাবার আয়োজন করতে লাগলো। তৃণা বললো, "আজকে স্কুলে না গেলেই পারতে। তিয়াসকে ভালো করে ডাক্তার দেখানো দরকার। তাছাড়া হঠাৎ যদি বাড়াবাড়ি হয় তবে আমি একা সামলাতে পারবোনা"। পলাশ বলল, "না গেলে ভাল হতো সেটা আমিও বুঝতে পারছি। কিন্তু আমাদের হেডস্যারকে তো জানো, স্কুলে না গেলেই উনি ভাবেন যে আমি বাড়িতে বসে ঘুমুচ্ছি। তাছাড়া আজকে স্কুলে একটা জরুরী মিটিং আছে টিচার্স-কাউন্সিলের। হেডস্যার বলে দিয়েছেন যে সবাইকে এই মিটিং এ উপস্থিত থাকতে হবে। তাছাড়া আমি ডাক্তারকাকুকে ফোনে বলে দিচ্ছি। আর যাবার সময় আমি শঙ্করকে বলে দিয়ে যাবো তোমাকে ঠিক আটটার সময়ে রিক্সা নিয়ে এসে ডাক্তারকাকুর চেম্বারে নিয়ে যাবার জন্য।

আজকে ন'টা দশের বাসটা ঠিকভাবে পেয়ে গেল পলাশ। রাস্তাঘাট কোনও জ্যাম না থাকায় ঠিক সময়েই স্কুলে পৌঁছালো। কিন্তু মনটা ভারাক্রান্ত ও চিন্তাগ্রস্ত। বারবার তিয়াস এর শুকনো মুখটা মনে পড়ছে। ক্লাসে পড়াতে গিয়েও ঠিকমত পড়ানোয় মন দিতে পারলো না। ইতিহাসের শিক্ষক কমলবাবু ওকে দেখে বললো, "কি পলাশ, চোখমুখ শুকনো লাগছে কেন? শরীর খারাপ নাকি?" পলাশ বললো, "গতরাত থেকে তিয়াস এর খুব শরীর খারাপ। আজ সকালে তৃণাকে বলে এসেছি ডাক্তার দেখানোর জন্য। মনটা খুব চঞ্চল আছে।" কমলবাবু বললো, "আজ তো ছুটি নিলেই পারতে।" পলাশ বললো, "তুমি তো হেডস্যারকে জানো। ছুটি নিলেই মাথা গরম। কোনো কারণই শুনতে চান না। তার উপরও আজ আবার T.C.-র জরুরী মিটিং আছে।

হঠাৎ পলাশ এর পকেটে রাখা মোবাইলটা বেজে উঠলো। পলাশ ফোনটা অন করে দেখলো তৃণার ফোন। ফোনের ওপার থেকে তৃণা বললো, "শোনো, তিয়াস এর জ্বর আবার বেড়েছে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, বারবার জল খেতে চাচ্ছে। ডাক্তারকাকুকে দেখিয়ে ঔষুধ নিয়ে এসেছি। কিন্তু ওষুধ খাওয়ালেই বমি করে দিচ্ছে। আমার খুব ভয় করছে গো। তুমি একটু তাড়াতাড়ি চলে এসো। " "আচ্ছা দেখছি", বলে ফোন রেখে দেয় পলাশ। তাড়াতাড়ি ব্যাগ গুছিয়ে হেডস্যারের ঘরে এসে দেখলো যে তিনি ও অফিসের বড়বাবু দুজনেই বাইরের একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে জরুরী আলোচনায় ব্যস্ত। পলাশ একটু ইতস্তত করেই বলো, "স্যার, আমার ছেলের শরীটা হঠাৎ খারাপ হয়েছে। ভীষণ জ্বর, কিছুই খেতে পারছে না। আমি একটু বাড়ী যেতে চাই"। হেডস্যার বিরক্তমুখে খিঁচিয়ে উঠে বললেন, "স্কুলে এসেই কেবল বাড়ী যাই যাই, আর একটা না একটা অজুহাত দিলেই হ'ল। তাছাড়া সবাই চলে গেলে T.C. এর মিটিংটা কি আমি একাই করবো?" পলাশ মিনমিনে গলায় বলার চেষ্টা করে, " না স্যার, সেরকম বাড়াবাড়ি না হ'লে বাড়ী যেতাম না। "ঠিক আছে আসুন" বলেই জরুরী আলোচনায় ব্যস্ত হন হেডস্যার।

ভারাক্রান্ত মনে বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে প্রায় আধঘন্টা অপেক্ষা করার পর একটা বাস পাওয়া গেলো। তাও লোকাল বাস অর্থাৎ সব স্টপেজে থামবে। কোনরকমে বাসে উঠে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর সামনের সীটের ব্যক্তি নেমে যাওয়ায় বসার সীট পেল পলাশ। শালবনী বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে বাস থেকে নেমে তৃণাকে ফোন করলো পলাশ। ওপার থেকে তৃণা বললো, "শোনো, তুমি ওখান থেকেই হাসপাতালে চলে এসো। তিয়াস - এর অবস্থা খুব খারাপ হওয়ায় ওকে হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্ত্তি করেছি"।

পলাশ একটা রিক্সা ভাড়া করে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে

এসে হন্তদন্ত হয়ে শিশুবিভাগে হাজির হয়ে দখলো, তৃণা ও কয়েকজন পাড়ার ছেলে সেখানে হাজির রয়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তে ডাক্তারবাবু ICU রুম থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "দুঃখিত ম্যাডাম, আপনার ছেলেকে আমরা সবরকম চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারলাম না। আর একটু আগে আনলে হয়ত ভালো হত।" কথা শুনেই চোখেমুখে অন্ধকার দেখে বসার বেঞ্চিটার উপর ধপাস করে বসে পড়লো পলাশ।

।। ৩।।

দিন যায়, মাস যায়, কালের অমোঘ নিয়মে সবকিছুকেই মেনে নিতে হয়। পলাশ ও তৃণার অবস্থাও সেইরকম। অন্তরে তীব্র যন্ত্রণা নিয়েও নিত্যদিনের কাজকর্ম করে যেতে হয়। কারণ প্রকৃতির নিয়মে চলাটাই নিয়ম, কোন কিছু প্রতিকূল অবস্থাকেই সে গ্রাহ্য করে না। তৃণা এখন খুব কম কথা বলে, চোখেমুখে আগের মতো সেই উজ্জ্বলতা নেই। শুধু দম নেওয়া পুতুলের মত কাজ করে যায়। পলাশের অবস্থাও অনেকটা সেইরকম। তৃণা এখন পলাশের দিকে ভাল করে তাকিয়েও কথা বলে না। পলাশও ভয়ে তৃণাকে কিছু বলতে পারে না। তৃণার ধারণা, পলাশ সেদিন স্কুলে না গিয়ে ছুটি নিয়ে বাড়ীতে থাকলে হয়তো এই অঘটন ঘটতো না। পলাশের মধ্যেও একটা অপরাধবোধ কাজ করে। এইভাবেই দিন গড়িয়ে চলে। কয়েকমাস পরে হঠাৎ একদিন সকালে তৃণা খুবই অসুস্থ বাধ করে এবং মাথাঘুরে পড়ে যায়। পলাশ তখন স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। হঠাৎ তৃণার গোগানির আওয়াজ শুনে দেখে তৃণা মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে গোঙাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ওকে তুলে বিছনায় শুইয়ে দেয় পলাশ। ডাক্তারকাকুকে ফোন করে বলে এক্ষুনি এসে দেখে যাবার জন্য। ডাক্তারকাকু এসে তৃণাকে ভালভাবে দেখে বললেন, "রক্তচাপ খুব কমে গেছে, শরীরও খুব দুর্বল হয়েছে, ভালো করে খাওয়াদাওয়া না করার জন্য। মানসিক চাপও খুব রয়েছে। এখন বেশ কিছুদিন বিশ্রাম নিতে হবে, খুব হাল্কা কাজ করতে হবে আর খাওয়াদাওয়া ঠিকমত করতে হবে। বুঝতে পারছি তিয়াস হঠাৎ চলে যাওয়ার জন্যই এরকম হয়েছে। কিন্তু কি করবে মা, বাস্তব বড় কঠিন। সে তো তোমার নিয়ম মেনে চলে না। তাই তাকে মেনে নিয়েই আমাদের চলতে হয়। আর পলাশ, তুমি বৌমার খাওয়া-দাওয়ার ও শরীর স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দিও। সবসময় স্কুল আর বাড়ী করলেই তো হবে না।"

শান্তমুখে পলাশ ডাক্তারবাবুকে এগিয়ে দেয় বড়রাস্তা পর্যন্ত এবং তারপর বাড়ী ফিরে আসে। এবার হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় আজ স্কুলে M.C. এর অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচনের দিন। আর হেডস্যার বলে দিয়েছেন যে আজ কোন শিক্ষকেরই ছুটি তিনি মঞ্জুর করবেন না। সবাইকেই উপস্থিত থাকতে হবে। সেটা মনে পড়াতেই সে তৃণাকে বলে, "শোনো, তোমার ওষুধপত্রগুলে আমি সোমনাথকে দিয়ে আনিয়ে দিচ্ছি। আর সীমাকেও বলে দিয়ে যাচ্ছি তোমার কাছে থাকার জন্য। স্কুলে আজ M.C. তে অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচনের ভোট। হেডস্যার আজ কোনমতেই ছুটি মঞ্জুর করবেন না। কাজেই আমার না গিয়ে উপায় নেই। তবে আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসব আর কয়েকদিন ছুটি নিয়েও আসব।"

তৃণা বিরক্তমুখে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, " আমি তো তোমাকে কোনদিন আমার কাছে থাকতে বলি নি। তুমি তোমার স্কুল আর পড়াশুনো নিয়েই থাকো। আর কেউ তো স্কুল, কলেজ বা অফিসে চাকরি করে না, আর তারা ছুটিও নেয়না! শুধু তুমিই ব্যতিক্রম। সেদিনও তুমি যদি স্কুলে না গিয়ে বাড়ীতে থাকতে, হয়তো এমনভাবে তিয়াসকে আমাদের হারাতে হতো না। জীবনে শু পড়াশুনা, স্কুল ও বাড়ী এই নিয়েই তো কাটালে। সংসার ধর্মের অন্য দিকগুলো - লৌকিকতা, বেড়াতে যাওয়া সিনেমা, থিয়েটার দেখা — এগুলোর তো তোমার কাছে কোনা দামই নেই।" নীরবে শুনে যায় পলাশ কি উত্তর দেবে সে? তাই চুপ করে সরে যায় সে সেখান থেকে।

সমস্ত ব্যবস্থা সেরে স্নান করে দুটি বিস্কুট ও চা খেয়েই বেরিয়ে পড়ে পলাশ ইস্কুলের উদ্দেশ্যে। আজ বাসে উঠে বসার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়েই আসতে বাধ্য হয় পলাশ। মাথায় একটা বিরাট চিন্তা, তৃণার কথাগুলো তার মাথায় ঘুরতে থাকে। সত্যিই তো পড়াশুনা, স্কুল আর বাড়ী ছাড়া আর কী করলো সে জীবনে। অথচ একটাই তো জীবন। বিবেকানন্দের কথা

মনে পড়লো তার। " এসেছিস্ যখন, তখন একটা দাগ রেখে যাবি"। কিন্তু সে কী দাগ রেখে যেতে পারলো এ জীবনে? স্কুলে তার বদনাম "লেটলতিফ" বলে। নিজেই নিজেকে ধিক্কার দেয় সে।

বাসস্ট্যান্ডে নেমে আজ সে একটা রিক্সা নিল। অন্যদিন হেঁটেই যায়। স্কুলের গেটে এসে দেখলো লোকে লোকারণ্য। চারিদিকে ফেস্টুন পতাকার ছড়াছড়ি। যেন বিধানসভা বা লোকসভার নির্বাচন। কোনোরকমে ভিড় ঠেলে এগিয়ে স্কুলে ঢোকে সে। ব্যালটপেপার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিস নিয়ে নির্দিষ্ট বুথে ঢুকে যায় সঙ্গীসহ। কাজকর্মও শুরু করে। কিন্তু তার মন পড়ে থাকে বাড়ীর দিকে, তৃণার দিকে। মাথার মধ্যে বাজতে থাকে তৃণার কথাগুলো। যাইহোক, কোনরকমে সবকিছু ঠিকঠাক শেষ করে বাসস্ট্যান্ডের দিকে পা বাড়ায় পলাশ। বাসে করে বাসস্ট্যান্ডে নেমে, তারপর সাইকেল গ্যারাজ থেকে সাইকেল নিয়ে যখন বাড়ীর দরজায় নামে তখন প্রায় গোধূলি বলা চলে। বাড়ীর দরজার পাশে কলিং বেলের বোতাম টেপে সে। একবার, দু'বার, তিনবার। না, কোন সাড়াশব্দ নেই। তবে কি তৃণা বাথরুমে গেছে। নাহলে ঘুমিয়ে পড়েছে। আবার বেলের বোতামে হাত দেয় পলাশ। না, এবারও কোন সাড়া নেই। ইতিমধ্যে পাশের বাড়ি থেকে সোমনাথ ও পথ চলতি আরও দু'একজন দাঁড়িয়ে যায় সেখানে। "কি হল পলাশকাকু কাকিমা দরজা খুলছে না? সোমনাথ বলে।

"হ্যাঁ, অনেকক্ষণ থেকে ডাকছি, কিন্তু সাড়া পাচ্ছি না।" শেষ পর্যন্ত সাড়া না মেলায়, আরও কয়েকজনের সাহায্য নিয়ে জোরে ধাক্কা মেরে দরজা ভেঙে ফেলে পলাশ। কোনরকমে সাইকেলটা রেখে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দেখে তৃণা ঘুমিয়ে আছে। গায়ে ধাক্কা দিয়ে জোরে ডাকে, "তৃণা, শুনতে পাচ্ছ, আমি এসে গেছি।" কিন্তু কোন সাড়া পায় না সে। হঠাৎ খুব ভয় পেয়ে যায় পলাশ। তবে কি.... তৃণার নাকের নীচে হাত দিয়ে বোঝার চেষ্টা করে সে। এবং তারপরই তৃণা....... বলে চিৎকার করে হাউমাউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে তৃণার শরীরের উপর আছড়ে পড়ে পলাশ।

॥ ৪ ॥

সৎকার, সংস্কারগত পারলৌকিক ক্রিয়া এইসব সেরে উঠতে দিন পনেরো লেগে গেল। এই পনেরো দিন সে স্কুল থেকে অর্জিত ছুটি নিয়েছিল। স্কুলের হেডস্যার এবং অন্যান্য সহকর্মীরাও সমবেদনা জানাতে বাড়ীতে এসেছিলেন। কিন্তু এরপর কি করবে ভেবে পায় না পলাশ। বাড়ী একেবারে ফাঁকা। এ ঘরে, ও ঘরে,.... রান্নাঘরে — সব জায়গাতেই রয়েছে তিয়াস ও তৃণার স্মৃতি। ওগুলো দেখে আর স্মৃতির গভীরে ডুব দেয় সে। কিছুই ভাল লাগে না তার। জগৎসংসারে সে এখন একেবারে একা। বাবা, মা দাদা-দিদি, শ্বশুর-শাশুড়ী এঁরা সবাই চলে গেছেন। আত্মীয়স্বজন কিছু আছেন — কিন্তু তাঁরা আছেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। তৃণার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে তাঁরা এসেছিলেন - কিন্তু তারপর নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেছেন। এখন পলাশের কোন কিছুতেই মন বসে না, কিছুই করতে ইচ্ছা হয় না তার। পড়তে ও পড়াতে তার আগে এত ভাল লাগত, কিন্তু এখন আর বইপত্র ছুঁতেই ইচ্ছা করে না। গান-বাজনাতেও খুব শখ ছিল তার। ভাল বেহালা বাজাত সে। তৃণা শুনে বলত, "আচ্ছা, তোমার বেহালায় সবসময় এত করুণ সুর বাজাও কেন, বলতো?" কিন্তু এ জগতে যে মারা যায়, চলে যায় - সেই বেঁচে যায়। আর যে বেঁচে থাকে, তাকে নিত্যদিনের নিয়ম মেনেই থাকতে হয় এবং জীবনযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। পলাশ ভাবে, এই জীবনে কি পেল সে? সে তো বেশী কিছু চায়নি। সে চেয়েছিল ভাল করে সবকিছু পড়তে ও পড়াতে, আর কিছু ভাল ছাত্র তৈরী করতে যারা হবে তার সৃষ্টি ও নির্দেশনায় তৈরী, তার মৃত্যুর পর তারা তাকে মনে রাখবে। এভাবেই সে জীবনে একটা দাগ রেখে যেতে চেয়েছিল। আর চেয়েছিল তিয়াস ও তৃণাকে নিয়ে একটা সুখের সংসার। তিয়াসের উপর অনেক আশা ছিল তার। তার আশা ছিল তিয়াস বড় হয়ে কলেজের অধ্যাপক হবে। সে নিজে তো স্কুল শিক্ষকের উপর আর যেতে পারলো না। কোনদিন কারও কোন ক্ষতি করে নি সে। কিন্তু এ সবের বিনিময়ে কি পেল এ জীবনে? ভেবেও কোন কূলকিনারা করতে পারলো না পলাশ।

॥ ৫ ॥

ইতিমধ্যে অর্জিত ছুটি শেষ হওয়ায় স্কুলে যোগ দিতে বাধ্য হয় পলাশ। সহকর্মীরা প্রত্যেকেই তাকে সমবেদনা জানায়। এমনকি হেডস্যার ও এখন তাকে আসা-যাওয়ার ব্যাপারে সেরকম কিছুই বলেন না। পলাশ স্কুলে আসে, কোনরকমে ক্লাস করে আর বাড়ী যায়, — যেন দম দেওয়া পুতুল। কিন্তু প্রাণের শান্তি, মনের আরাম সে পায় না। এভাবে চলতে চলতে তার শরীর ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করে। খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত হয় না। বেশীর ভাগ দিনই রান্না করে না সে, হোটেলে খেয়ে আর প্যাকেটের খাবার কিনে খেয়েই দিন কাটিয়ে দেয়। এজন্য মাঝেমধ্যে শরীর খারাপ হয় তার।

বছরখানেক পরের ঘটনা। স্কুলে তখন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। হেডস্যার যথারীতি নোটিস দিয়েছেন, পরীক্ষার দিনে উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া কোন ছুটি মঞ্জুর হবে না। সেদিন মঙ্গলবার থেকে পলাশ শারীরিক অস্বস্তি অনুভব করে। ঘুম আসে না, বুকের বাঁ দিকে একটা চিনচিনে মৃদু ব্যথা অনুভব করে সে। ভাবে, হয়ত পেটে গ্যাস হয়েছে, তাই এই ব্যথা। উঠে বাথরুমে গিয়ে তারপর গ্যাসের ঔষুধ ও জল খেয়ে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করে। কিন্তু ঘুম আসে কই! নানা কথা মনের মধ্যে ভেসে ভেসে আসে। সকালের দিকে হয়ত একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল, মোবাইল এর alarm -এর শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে, মুখ-হাত ধোয়, কিন্তু শরীরটা ম্যাজম্যাজ করে। বুকের চিনচিনে ব্যথাটা যেন একটু বেশী বলে মনে হয়। একবার ভাবে, আজ আর স্কুলে যাবে না। হেডস্যারকে একটা ফোন করে দেবে। কিন্তু আবার ভাবে বাড়িতেই বা কি করবে সে! তাই শেষে কোনোমতে করেও স্নানটান সেরে স্কুলে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ে সে। বাসস্টপেতে এসে নটা দশ বাসটা পেয়েও যায়। কিন্তু পলাশ বুঝতে পারে বুকে ব্যথাটা যেন এখন আরো বেড়ে গেছে। একটু ঘামতেও শুরু করে সে। নলহাটী বাসস্টপেতে নে অনুভব করে বুকের ব্যথাটা এখন অনেক বেড়ে গেছে হাঁটতে বা কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে তার। একবার ভা স্কুলে যাওয়ার আগে একবার জগৎ ডাক্তারের চেম্বা নিজেকে দেখিয়ে নেবে কিনা। আবার ভাবে তাহলে স্কু পৌঁছাতে দেরী হয়ে যাবে। না, বরং স্কুলেই যাওয়া যা একটা রিক্সা ভাড়া করে এসে স্কুলের গেটে নামে স দেখে স্কুলের গেটে অসংখ্য পরীক্ষার্থীদের ও তাদে অভিভাবকদের ভিড়। একটা কলরব চারিদিকে। পলা তখন অনুভব করে প্রচণ্ড ঘামছে সে আর বুকের ভিত তীব্র যন্ত্রণা। মনে হচ্ছে যেন কেউ নখ দিয়ে আঁচড়ে-কাম দিচ্ছে। চলার কোন শক্তিই যেন নেই তার। তবুও প্রাণ চেষ্টায় পলাশ কোনরকমে ভিড় ঠেলে স্কুলের মা প্রবেশ করে। মনে হচ্ছে এখুনিই যেন সে বসে পড় আর হাঁটার শক্তিও নেই তার। প্রাণপণ শক্তিতে বুক চে টলতে টলতে হাঁটতে শুরু করে পলাশ। দু' একজ শিক্ষাকর্মী তাকে ঐভাবে হাঁটতে দেখে প্রশ্ন করে, "স্যা শরীর খারাপ না কি?" কিন্তু কিছুই যেন কানে যা না পলাশের। কোনরকমে টলতে টলতে বুকাতে চেপে ধরে হেডস্যারের ঘরের সামনে এসে দাঁড়া দরজার ভারী পর্দা সরিয়ে দেখে তিনি পরীক্ষার প্রশ্ন বিলির ব্যবস্থায় ব্যস্ত আরও দু'একজন শিক্ষকের সা হেডস্যারকে উদ্দেশ্য করে পলাশ বলে, "স্যার, আ এসে গেছি। আমি হা—জি—র— বলেই হেডস্যা ঘরের দরজার চৌকাঠের উপর কাটা গাছের মত লুটি পড়ল, আর উঠল না।

২৬শে জানুয়ারী, জাতীয় দিবসে পতাকা উত্তোলনের পর কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি শ্রী বিপ্লব ওঝা, তৎকালীন অধ্যক্ষ ড. নুরুল হুদাসহ অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীগণ।

দিশারী

প্রজাতন্ত্র দিবসে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ ড. নুরুল হুদা

প্রজাতন্ত্র দিবসে এন.সি.সি.-এর শোভাযাত্রা।

দিশারী

রবীন্দ্রনাথের উপর আলোচনায় রবীন্দ্র নাটক সম্পর্কে বক্তব্য রাখছেন
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক ড. শিবব্রত চট্টোপাধ্যায়।

'বোলপুর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা'

'শান্তি নিকেতন ভ্রমণ কথা' প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা

মন্দিরা প্রামাণিক

বাংলা (তৃতীয় বর্ষ)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়...

"জন্তুরা পেয়েছে বাসা, মানুষ পেয়েছে পথ"।

মানুষ চিরপথিক এবং ভ্রমণশীল, পথ চলতে তার বড়ই আনন্দ, পথিক মন কোনো কোনো সময় ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চায়না, চলে যেতে চায় মন কোথাও অন্য কোনো খানে, কেননা অদেখাকে দেখা আর অচেনাকে চেনা মানুষের একটা সাধারণ প্রবৃত্তি। প্রকৃতির টানে, সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে মানুষের মন অনেক দূর চলে যেতে চায়, শুধুই যে দূরে চলে যায় তা নয়, সেখানে গিয়ে বিবিধ অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় হয় যা জীবনে বিভিন্ন পদক্ষেপে কাজে লাগে, আর সেই মনোমুগ্ধ অভিজ্ঞতা স্মৃতির কোণে চিরন্তন সঞ্জীবিত হয়ে থাকে। এমনই এক অভিজ্ঞতা হল বোলপুর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, যা আমার মনে স্মৃতির সর্বোত্তম সিংহাসনে চির উজ্জ্বল হয়ে রয়ে যাবে।

প্রতি বছরই আমাদের বাংলা বিভাগ থেকে শান্তিনিকেতন ঘুরতে নিয়ে যাওয়া হয়, তাই অনেক দিন আগে থেকেই আমরা স্যারের কাছে বায়না ধরি শান্তিনিকেতন নিয়ে যাওয়ার জন্য। দিনও ঠিক করে ফেলি একটা, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত স্যারের শরীর খারাপ এবং কাজের চাপের কারণে সেই দিনটিতে আমাদের যাওয়া হলনা। আমাদের সকলের মন খারাপ হয়ে যায় এবং আমরা শান্তিনিকেতনে যাওয়ার আশা ছেড়েও দিই। এর কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন স্যার বললেন, কলেজ থেকে এবারে শান্তিনিকতনে নিয়ে যাবে। শোনামাত্র মনের মধ্যে একটা খুশির জোয়ার চলে আসে। এক মুহুর্তের মধ্যে কত কিছুই ভেবে নিলাম। ছোটোবেলা থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কত কিছুই না স্যারদের কাছ থেকে শুনেছি, বই পড়ে জেনেছি, সেই কবিগুরুর দেশ শান্তিনিকেতন! কেমন হবে সেই শান্তিনিকেতন! এইসব ভাবতে ভাবতে কলেজ থেকে বাড়ি ফিরলাম। বাবা মাকে জানালাম শান্তিনিকেতনে যাওয়ার কথা।

যাওয়ার দিন ঠিক হল মঙ্গলবার, ২০ তারিখ, আমি সেই দিনটির জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। লোহাপুর স্টেশনে ট্রেনটি ৬টার সময়, তার আগেই আমাদের লোহাপুর পৌঁছতে হবে। আগের দিন, রাতটা যেন কাটিতেই চায়না, যদি উঠতে না পারি সময় মত, এই ভেবে ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখি, কিন্তু ঘুমই আসেনা, অবশেষে ভোর হয়ে এল এলার্ম বেজে ওঠার আগেই আমি উঠে পড়ি। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিয়ে আমি এবং আমার তিন জন বন্ধু মিলে ৫টার সময় রওনা দিলাম ট্রেন ধরার উদ্দেশ্যে। অন্ধকার তখনও সম্পূর্ণভাবে কাটেনি, চারিদিকে কুয়াশায় আচ্ছন্ন। আমরা যখন স্টেশনে পৌঁছোলাম তখন বাজে পৌনে ছটা, অপেক্ষা করতে লাগলাম আজিমগঞ্জ লোকাল-এর জন্য।

অপেক্ষা করতেই থাকি,করতেই থাকি, কিন্তু ট্রেন আসেনা, ট্রেনটা আজ প্রায় এক ঘণ্টা লেট। মনে মনে ভাবলাম ট্রেনটাকে আজকেই লেট করতে হল। ট্রেন যখন এল তখন প্রায় পোনে ৭টা, সব চেয়ে শেষ কামরায় আমরা চারজন উঠে পড়লাম। নলহাটি পৌঁছোলো ট্রেন। সেখানে কলেজের আরো অনেক ছাত্র-ছাত্রী এবং স্যারেরা চাপলেন। আমরা একদম শেষ কামরায়। স্যারের সঙ্গে বসে যেতে পারলাম না বলে মনের মধ্যে একটু দুঃখ হল। স্যারকে আমরা দেখা ক'রে এসে নিজেদের জায়গায় এসে বসে পড়লাম। স্টেশনের নাম দেখতে দেখতে আর গল্প করতে করতে পৌঁছে গেলাম প্রান্তিক। সেখানে নেমে পড়লাম। কিছুটা হেঁটে গিয়ে দেখলাম তিনটি বাস আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, তার মধ্যে একটি বাসে আমরা, মানে আমাদের বাংলা বিভাগের সকলে চেপে পড়লাম। তারপর রওনা দিলাম শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যে। বাসের মধ্যেই আমাদের টিফিন পর্বটা সারা হল। চারিদিকে গাছগাছালি আর বন্ধু-বান্ধবদের খুনসুটি দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে গ'ড়ে তোলা শান্তির দেশে।

বাস থেকে নেমে সকলে একত্রিত হলাম। তারপর টিকিট-কাউন্টারে স্যারেরা টিকিট কাটলেন আমাদের জন্য। তারপর স্যারদের সঙ্গে আমরা প্রবেশ করলাম রবীন্দ্রভবনে। সে যেন এক অন্য কোনো দেশে প্রবেশ করলাম। সবার

প্রথমে আমরা গেলাম একটা বড় মিউজিয়ামে সেখানে সব জিনিস দেখে মুগ্ধ হলাম। রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে আঁকা চিত্র, চিঠি, বিভিন্ন মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে কাটানো রবীন্দ্রনাথের নানান মুহূর্তের ছবি, রবীন্দ্রনাথ কে দেওয়া বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রকম উপহার, কিছুটা নিজে বোঝার চেষ্টা করলাম আর যেটা বুঝলাম না, সেটা স্যারকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, এই সমস্ত জিনিস দেখে বারবার রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতার লাইন আমার মনে আসতে লাগল....

"আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে
তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে।"

সমস্ত কিছু বস্তুর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব অনুভব করার চেষ্টা করলাম। আর মনে মনে ভাবলাম রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসেন না এমন মানুষ বোধ হয় পৃথিবীতে নেই। সবাই তাঁকে কতই না ভালোবাসত।

ওখান থেকে বেরিয়ে এসে উদয়ন, কোণার্ক দেখলাম। স্যারের কাছ থেকে এই সম্পর্কে অনেক তথ্য পেলাম, তারপর দেখলাম 'শ্যামলী' নামক রবীন্দ্রনাথের মাটির ঘরখানি, গ্রীষ্মকালে রবীন্দ্রনাথ বেশির ভাগ সময় এখানেই কাটাতেন। তারপর আরো দুটি গৃহ দেখলাম 'পুনশ্চ' এবং 'উদীচি', তার ঠিক পাশেই দেখলাম নানান রকম গোলাপের বাগান। সব কিছু দেখতে দেখতে মনে হল এত সুন্দর জায়গায় বসে কবিতা লিখতেন বলেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথের কবিতা এত সুন্দর। যাই হোক ওখান থেকে বেরিয়ে চলে এলাম।

তারপর গেলাম বিশ্বভারতী। সেখানে নানান বিভাগ পরিদর্শন করলাম। স্যারদের কাছ থেকে জানতে পারলাম কোথায় কোন বিভাগের ক্লাস হয়। অনেক ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে আমরা স্যারকে বার বার হারিয়ে ফেলছিলাম। তাই নিজে নিজে ঘুরেই দেখতে হল। বিশ্বভারতী দেখা হয়ে গেলে আবার আমরা বাসে উঠে পড়ি, তারপর কিছুটা গিয়ে নামার পর একটা জায়গায় এসে উপস্থিত হই। সেখানে প্রচুর গাছগাছালি আর মস্ত বড় একটা খাদ। স্যারকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারি, এটার নাম 'সোনার ঝুড়ি' ঠাকুর বাড়ির সদস্যরা এখানে মাঝে মাঝে আসতেন। ওখান থেকে চলে আসার পর আমাদের খাওয়া-দাওয়া পর্ব শুরু হয়। ... আমরা কজন বন্ধু মিলে যাই একটা পার্কে। সেখানে ... বিশ্রাম নিয়ে রওনা দিই বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে। ফেরার ... মনটা খারাপ হয়ে যায়। কবিগুরুর লেখায় একটা ... বার মনে হতে লাগল.....

ওরে, যাবনা আজ ঘরে রে ভাই
যাব না আজ ঘরে!

শান্তির সে দেশ থেকে মন যেন বেরোতেই চা... না। বাড়ি ফিরে গেলেই তো সেই আবার একঘেয়েমি ... কিন্তু ফিরে তা আসতেই হবে। বাস এসে পৌঁছে ... আবার সেই প্রান্তিক স্টেশনে। আবার সেই ট্রেনের ... অপেক্ষা করতে থাকি। একটা ট্রেন এল তাতে আমাদের ... বন্ধু-বান্ধব চলে গেল। আমরা সেই আজিমগঞ্জ ট্রেনের ... অপেক্ষা করতে থাকলাম এবং একসময়ে ট্রেন এল ... বন্ধুবন্ধব মিলে চেপে পড়লাম। গল্প করতে করতে ... দিকে রওনা হলাম।

বোলপুর অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এক অমূল্য অভি... রবীন্দ্রনাথের গল্প, কবিতা, নাটক যতই পড়িনা ... শান্তিনিকেতনে না গেলে রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ ভাবে ... বা বোঝা কখনই সম্ভব হত না। তা উপলব্ধি করতে পার... স্যারের মুখ থেকে কবিগুরু সম্পর্কে অনেক কথা শু... আজ বুঝলাম রবীন্দ্রনাথ কী, তার স্বহস্তে গ'ড়ে ... শান্তির নীড় কেমন। সত্যিই যেন সেখানে সবসময় ... বিরাজ করে। রবীন্দ্রনাথকে জানার এবং বোঝার শেষ ... তাঁকে বুঝতে বুঝতে সারা জীবনই কেটে যাবে। তবুও ... এই অভিজ্ঞতা থেকেই কিছুটা হলেও কবিগুরুকে ... পেরেছি আর যা আমার ভবিষ্যৎ পদক্ষেপে কাজে ...

"তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর
যবে আমার জনম হবে ভোর
চলে যাব নবজীবন লোকে
নূতন দেখা জাগবে আমার চোখে
নবীন হয়ে নূতন সে আলোকে
পরব তব নবমিলন ...
তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর ...

আবার যদি কখনও সুযোগ পাই, তাহলে ছু... রবীন্দ্রনাথের শান্তির দেশে অবশ্যই।

'শান্তিনিকেতন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা'

'শান্তি নিকেতন ভ্রমণ কথা' প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় স্থানাধিকারী রচনা

মুস্তাফিজুর রহমান
বাংলা (তৃতীয় বর্ষ)

আমি গ্রামের ছেলে এবং ছোটবেলা থেকেই গ্রাম্য পাঠশালার সেই ছোট্ট কুটিরেই আমার হাতেখড়ি। গ্রাম পেরিয়ে যখন হাইস্কুলে ভর্তি হলাম সেদিন আমার যে কী আনন্দ হয়েছিল তা হয়তো বলতে পারবো না। মনের মধ্যে যে আশা জাগতে শুরু করলো, শিক্ষক মাশাইদের সঙ্গে ভ্রমণে যাবো, তাঁদের সান্নিধ্য পেয়ে নিজেকে ধন্য করবো, — আরও কত কী। তবে তা অধরাই থেকে গেল। তেমন সুযোগ আর পেলাম না। তাই, স্বভাবতই প্রাণের স্পন্দন গেল কমে। শিক্ষক মশাইদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণে যাবার ইচ্ছাটাও গেল মরে। 'এডুকেশনাল ট্যুর' যে আসলে কী, তার গুরুত্বই বা কোথায়, তা আর জানা হলনা। তাই 'ট্যুর' কথাটা আমাকে আর নাড়া দিত-ও না, আমার কাছে শব্দটা অন্ধকারের মতোই শোনাত। তবে মনের মধ্যে যে একেবারেই ইচ্ছাটা মরে গিয়েছিল তা নয়। তার সামান্য অংশ মনের গোপন প্রকোষ্ঠের অন্তরালে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতো, আবদ্ধ নির্জরের মতোই পথ খুঁজতো, তবে তা সম্ভব হয়নি বলেই এতদিন আমার মনের চারপাশের দেওয়ালে ধাক্কা মেরে মেরে ক্ষত বিক্ষত ক'রে তুলেছিল। কিন্তু যেদিন শুনলাম আমাদের কলেজ থেকে শিক্ষক মশাইগণ ছাত্রদের নিয়ে শিক্ষামূলক ভ্রমণ করবেন বলে ঠিক করেছেন, সেদিনই আমার ক্ষত হৃদয়ের মলম পড়বে ব'লে আশা করেছিলেম। মনটা না পাওয়াকেই পাওয়ার আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠেছিল। শিক্ষক মশাই আমাদের বললেন, শান্তিনিকেতনে, বিশ্বভারতীতে আমাদের ভ্রমণ করতে যেতে হবে; তারিখটা হল ২০ জানুয়ারী, ২০১৫ সাল। কাজেই বিলম্ব না করে আমরা বন্ধুরা মিলে সেদিনই স্যারের কাছে নাম নথিভুক্ত ক'রে ফেললাম। আর মনটা দুলতে শুরু করলো। হৃদয়ের সেলগুলোতে সেই ভ্রমণের একটি পূর্ণ চিত্র অঙ্কন করে ফেললাম, বাকি শুধু মিলিয়ে দেখা।

অবশেষে সেই শুভদিন এল। আমাদের যে ট্রেনে যেতে হবে, তার সময় সকাল ৬টা ৪০মিঃ। গ্রীষ্মকালে কোন সমস্যা হতনা। কিন্তু এখন শীতকাল এবং প্রচন্ড শীত। সেজন্য আমাদের সকলকেই সময়ের মূল্য দিতে হবে নচেৎ স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। আমাদের গ্রাম থেকে ছিলাম চারজন। ভোর বেলায় একে অপরকে 'কল' নতুবা 'মিসকল' দিয়ে জাগালাম সময় তখন ভোর ৪ টে। কাচিমের মতো লেপে মুড়িয়ে আছি, উঠতে ইচ্ছে যেন করছে না; কিন্তু সেই ভ্রমণের কথা মনে আসতেই শীত যেন ভয় পেল। আমরা যখন বাড়ি থেকে যাত্রা করলাম, তখন ৫টা ৩০ মিনিট। সাইকেলে আমাদের প্রায় আট-দশ কিমি পথ অতিক্রম করতে হবে। শীতের চাদরের তলা দিয়ে যখন যাচ্ছি মনে হচ্ছে, আঙুলগুলো এক একটা বরফের চাঙর। আর শরীরে বরফের পোশাক। শীতে কাঁপতে কাঁপতে যখন স্টেশনে প্রবেশ করছি, তখন লোকে লোকারণ্য। অবশেষে ট্রেন যখন ঢুকলো তখন ৬টা ৩০ মি. মোটামুটি। আমরা প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী দু-দিক থেকে ছুটে আসা জলের ধাক্কা লেগে মিশে যাবার মতোই ধাক্কা মেরে মেরেই ট্রেনে উঠলাম।

প্রান্তিক স্টেশনে যখন আমরা ট্রেন থেকে নামলাম, তখন সাড়ে দশটা। সেখান থেকে বাসে ক'রে আমাদের বিশ্বভারতীতে যেতে হবে। আমাদের স্যারেরা এবং আমরা ছাত্র-ছাত্রীরা, বিশেষ ক'রে বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা একটা আলাদা বাসে উঠলাম। বাস চলাকালীন শুরু হল টিফিন বিতরণ। গ্রাম্য মহিলারা যেমন কাঁথার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে সুচ ফুড়ে ফুড়ে এগোয়, তেমনি টিফিন বিতরণের এক সূতোয় আমরা সবাই গাঁথা পড়লাম। আমরা সকলে আনন্দ করতে করতেই পৌঁছে গেলাম আমাদের আকাঙ্ক্ষিত গন্তব্যস্থলে। সময় তখন সওয়া এগোরোটা।

বাস থেকে নেমে দাঁড়িয়ে আছি প্রতীক্ষায়। স্যারেরা

টিকিট কেটে এনে দিলেন আমাদের হাতে, আর আমরা সারিবদ্ধভাবে প্রবেশ করলাম রবীন্দ্রভবনে। সেখানে আমাকে প্রথমেই আকৃষ্ট করলো সেখানকার নীরবতা। এতলোকের সমাগমেও যেন মনে হচ্ছে কোন শব্দ নেই। বোঝা গেল সেখানকার প্রশান্তি সকলের হৃদয়ে মায়াজাল বিস্তার করেছে।

মিউজিয়ামে প্রবেশ ক'রে যা কিছু দেখলাম অত্যাশ্চর্য। সেখানে নেই কী। রবীন্দ্রনাথের বংশ পরিচয়, তার ব্যবহৃত পায়ের জুতো, তার স্ত্রী মৃণালিনীর চিত্র, পুত্র-কন্যাদের চিত্র। বিভিন্ন দেশ থেকে পাওয়া তাঁর নানা রঙের, নানা ভাবের, নানা জাতের উপহার সামগ্রী। এগুলো দেখে যেমন রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিভিন্ন দেশের মানুষের ভালোবাসা কতখানি ছিল, তা অনুমান করলাম; সেই সঙ্গে বিদেশী পাত্র, হুকোদানী, হাতির দাঁতের উপহার, এসরাজ প্রভৃতির সঙ্গে নিজেও পরিচিত হলাম।

মিউজিয়ামে যেটি আমাকে সবচেয়ে বেশি ব্যথা দিয়েছে তা' হ'ল নোবেল চুরির ঘটনা। রবীন্দ্রনাথকে নোবেল দিয়েছিলেন লন্ডনের লাইসিয়াম ক্লাব। সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা চার-পাঁচজন মিলে রবীন্দ্রনাথের শোবার ঘরে গেলাম, সেখানে বিছানা, গালিচা পাতা, নরম শোফা আজ রবীন্দ্রনাথকে হারানোর বেদনায় হাহুতাশ ক'রে যেন অশ্রুসজল দৃষ্টিতে প্রহর গুনছে, এমনকি তার আরাম করবার কক্ষও। পুরোনো কালের সেই রবীন্দ্রনাথের গাড়িটা আজও সচল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নেই বলে গাড়িটা ছবিতে পরিনত হয়েছে। এর মাটির ছাদ দেওয়া সেই উদিচী বাড়ি, যার পাশে আছে অনেক স্মৃতি। কত ফুলের গাছ, নানা বর্ণের, দেখলেই চোখ ঝলসে ওঠে, আর মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথের লেখা সেই কবিতা—

"স্বরূপ তার কে জানে! তিনি অনন্ত মঙ্গল,
অনন্ত জগৎ মগন সেই মহাসমুদ্রে
স্বরূপ তার কে জানে।.......................
কিংবা—
"নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে
হৃদয় তোমারে পায়না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে
রয়েছ নয়নে নয়নে....................."

—এগুলো রবীন্দ্র সঙ্গীত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা কখনো গান, গান কখনো কবিতা হয়। এসব মনে পড়তে পড়তেই মনটা তার অপার মহিমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠল, আমার মনটা ভাবে গদগদ ক'রে উঠলো। আমি এক মুহূর্তে ভুলে গেলাম, আমার অবস্থান কোথায়! বন্ধু নাড়া দিতেই হঠাৎ সম্বিত ফিরে পাই; আর পিছি ম্যামের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রভবনের বাইরে বেরিয়ে আসি। বাইরে এসে মনের মধ্যে একটা কথাই ঘোরাফেরা করতে লাগলো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৃদ্ধ বয়সে এত লাবণ্যম কেন? এ প্রশ্নের আর মীমাংসা করতে পারলাম না।

রবীন্দ্রভবন থেকে বেরিয়ে গেলাম ছাতিম তলা। সেখানে দেখলাম বিরাট বিরাট ছাতিম, শাল গাছ। গোলে একটি অজানা অচেনা ফলের গাছ। প্রথমে ভে ছিলাম সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য ছোট ছোট মাটির ভাড় ঝুলি রাখা হয়েছে। কিন্তু যখন আমরা শিক্ষক মাননীয় চৈত বিশ্বাস মহাশয়ের কাছ থেকে জানতে পারলাম ও মাটির তৈরী কোন পাত্র নয় — একটা ফল তখন ম মনে হেসেই মরে গেলাম। এমন আরও কত নাম জানা ফলের গাছ, ফুলের গাছ —। বিশ্বভারতী ভ্রম না গেলে এমন গাছ বোধহয় আর কোন দিনই দেখা পেতাম না। কাজেই কিছুটা আমার জীবনের অপূর্ণ পূরণ করেছে।

এখানে আমি সবচেয়ে বেশি অভিভূত হয়েছি শি ব্যবস্থা দেখে। প্রত্যেকটা বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে। অ প্রত্যেকটা বিভাগ যেন এক-একটা স্বতন্ত্র শিক্ষায়ত পাঠভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকমশাইদের সঙ্গে গাছতল বসেই শিক্ষালাভ করে। শিক্ষক একটা থামে ও ছেলেমেয়েরা চট পেতে বা বাঁধানো গাছের চারপা ... বসে পড়াশোনা করে। এতে বাহ্য প্রকৃতির স তাদের একপ্রকার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রকৃতির কো তারা বড়ো হয়, নিজের মতো করে ভাবতে শে আমাদের মতো চার দেওয়ালের ঘেরাটোপে বন্দী ন আর ছাঁচে ঢালা শিক্ষায় অভ্যস্তও নয়। কাজেই, আমা সঙ্গে বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনা মেলা ভ যেখানে নাচ, গান, চিত্রাঙ্কন, জ্যোতিষবিদ্যা, কৃষিবি সমাজবিদ্যা—নেই এমন কিছু আমার মনে নেই। দু বেলায় সবাই সার বেঁধে হৈ চৈ করতে করতে য

ক্যান্টিনে যাই, মনে হয়, সমুদ্রের ঢেউ বালুতটে ধাক্কা মেরে মিশিয়ে গেল। শুধু কি ছোটরা? না! আমাদের সমবয়সী আমাদের দাদা কাকার সমবয়সী সবাই-ই এমনই শিক্ষায় অভ্যস্ত। এরকম আড়ম্বর পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রেরণা আমার শিরায় শিরায় মিশে গিয়ে আমার অন্তরকে জাগিয়ে তুলেছে। এরকম শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রকৃত শিক্ষা হওয়া উচিত। যে শিক্ষায় কোন কিছু শিখতে পারবো না, সেরকম শিক্ষা অর্জন না করাই ভালো বলে মনে করি। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "রাশিয়ার চিঠি'র একটি উক্তি মনে পড়ে—"রাশিয়ায় না আসিলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকতো।" আমারও মনে হচ্ছে, সেই একই কথা। শান্তিনিকেতনে না এলে এজন্মের তীর্থদর্শন অসমাপ্ত থাকত!

ইতিমধ্যে অত্যন্ত ক্ষুধাকাতর; অথচ ক্ষুধা কে ক্ষুধা ব'লে ভাবতেই পরিনি। আনন্দের কাছে সবকিছু ম্লান হয়ে গিয়েছে। বিশ্বভারতী পরিদর্শন করে আমরা দেড়টা নাগাদ বাসে উঠে খোয়াই দেখতে গেলাম, সেখানে বাল্যাবস্থায় রবীন্দ্রনাথ ছোট ছোট পাথর কুড়িয়ে বাবা দেবেন্দ্রনাথকে উপহার দিতেন। সবমিলিয়ে প্রচুর মজা করেছি। অভিজ্ঞতা ও প্রেরণা পেয়েছি। অবশেষে তিনটে নাগাদ খাওয়া-দাওয়া ক'রে চারটে নাগাদ প্রান্তিক স্টেশনে ফিরলাম। বাড়ি ফিরতে রাত্রি দশটা হয়ে গেল।

পরিশেষে বলতেই হবে, 'Educational Tour' যে আসলে কী, তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমি পেলাম। বিশ্বভারতী সম্পর্কে মনে গেঁথে রাখা ছবির সঙ্গে বাস্তবের সেই বিশ্বভারতীর চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। আর যে কথাটা না বললে বলাটা অসমাপ্ত থাকে সেটা হল শিক্ষক মশাইদের অসামান্য পরিশ্রম ও গাইড। ড. চৈতন্য বিশ্বাস, মহাশয়, ড. মণিশংকর অধিকারী, মাননীয়া পিংকি দাস মহাশয়া, শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জী, গৌতম সেন, সুকুমার স্যার, দেবব্রত সাহা, নাজমূল হাসান এঁরা প্রত্যেকেই দায়িত্ব নিয়ে যেভাবে আমাদের গাইড করেছেন, তা' মৃত্যুকাল পর্যন্ত ভুলবার নয়। শিক্ষক মশাইরা যে Friend, Philosopher and guide - এটা কেবল বইএ পড়েছি। কিন্তু এই ভ্রমণের পর তার সত্যতা নিয়ে আর কোন সন্দেহের অবকাশই থাকলো না। বন্ধু-বান্ধবী, শিক্ষক-শিক্ষিকা - সব মিলিয়ে প্রচুর আনন্দ করেছি। শারীরিক ক্লান্তি সামান্য হ'লেও তা বিশ্বভারতীর অভিজ্ঞতালব্দ আনন্দের কাছে একেবারেই ম্লান হয়ে গেছে। তাই, বারবার রবীন্দ্রনাথের সেই কথাই মনে পড়ে, না এলে "এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।

বৃক্ষরোপন কর্মসূচীতে এন.এস.এস.-এর শিক্ষকগণ ও ছাত্র-ছাত্রীরা।

নির্বাক নজরুল কথা

চৈতন্য বিশ্বাস

বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় কবিদের নাম করতে গেলে অনেকেই যে রবীন্দ্রনাথের পরেই নজরুলের নাম করবেন, তাতে সন্দেহ নেই। দরিদ্র পরিবারের খেটে খাওয়া নজরুল কৈশোর বয়সেই অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়েছেলেন। তারপর ২৩ বছর বয়স থেকেই বিদ্রোহী কবি হিসেবে মানুষের মনে দাগ কাটতে শুরু করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ না হয়ে পারেননি। 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের কবিতা প'ড়ে তিনি প্রশংসা করেন। 'বিদ্রোহী' কবিতাটি তাঁর এতটাই ভালো লাগে যে, নজরুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'তেই তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। এক সময় জনপ্রিয়তায় তিনি রবীন্দ্রনাথকেও ম্লান করে দেন। অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে, অত্যাচারী মানুষের বিরুদ্ধে আগুন জ্বালাতে থাকেন। আমরা আশান্বিত হই। কিন্তু সে আশায় হঠাৎই জল ঢেলে দেয় কবির দুর্ভাগ্য! রবীন্দ্রনাথ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার পরপরই নজরুলের কবিকণ্ঠ একেবারে নীরব হয়ে গেল। ৭৭ বছর জীবিত থাকলেও শেষের ৩৪টা বছর লেখা তো দূরের কথা, কথাও বলেননি। একজন বোধহীন নির্বাক মানুষে পরিণত হন।

আসলে নজরুল এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। তাঁর বোধশক্তি নষ্ট হয়ে যায় চিরতরে। ১৯৩৫ সাল থেকেই নজরুলের মস্তিষ্কের অসুস্থতা ধরা পড়ে। চিকিৎসার জন্য প্রচুর টাকার প্রয়োজন ছিল। অতটাকা নজরুলের ছিল না। এমনিতেই তিনি ঋণগ্রস্থ ছিলেন। আবার ঋণ ক'রে নিজের চিকিৎসা করানোর সাহস এবং ইচ্ছা কোনোটাই তাঁর ছিলনা। ১৯৪২ সালের গোড়ায় রোগ যখন মারাত্মক হয়ে উঠতে থাকে, কথা বলতে কষ্ট হ'তে থাকে, তখন তিনি চিকিৎসার টাকা জোগাড়ের জন্য কাউকে কাউকে আবেদন জানাতে থাকেন। ১৭.৭.১৯৪২-এর লেখা নজরুলের এক চিঠিতে পাচ্ছি, " আমার Nerves Shattered হয়ে গেছে ৭ মাস ধরে হক সাহেবের কাছে গিয়ে ভিখারির মত ৫/৬ ঘন্টা ধ'রে ব'সে থেকে ফিরে এসেছি.... আমি ভালো করে চিকিৎসা করতে পারছি না।...... কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, অতি কষ্টে দু'একটা কথা বলতে পারি। বললে যন্ত্রণা হয় সর্বশরীরে।"

এই অসুখের কারণ স্পষ্টভাবে জানা যায় না; তবে কবি যে নিজের শরীরের প্রতি তেমন যত্ন নিতেননা। সেটা জানা যায়। নানান কাজে ব্যস্ত থাকতেন, সময় মতো খাওয়া-দাওয়া করতেন না। শুধু চা আর পান খেয়ে দিন কাটিয়ে দিতেন। অর্থাভাবই তাঁকে বিপর্যস্ত ক'রে তোলে। পুত্র বুলবুলের মৃত্যু, স্ত্রীর পক্ষাঘাত, নিজের অসুস্থতা, ঋণের বোঝা— এ সবের কারণে নজরুল মানসিক দিক থেকে ভালো ছিলেন না। এই রকম পরিস্থিতির মধ্যেই পুত্র সব্যসাচী উমা নামে এক পরিচারিকাকে বিবাহ ক'রে পৃথক বাসায় চলে যান। কনিষ্ঠ পুত্র অনিরুদ্ধ বিবাহ করেন কল্যাণী দত্তকে। অর্থাভাব আর মানসিক যন্ত্রণায় নজরুল আরো অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর প্রতি যত্ন নেবার, সেবা করবার কেউ ছিল না। তিনি ক্রমশ সম্বিৎ হারিয়ে একটা জড় পদার্থের মতো হয়ে যান। তাঁর পরিচর্যার জন্য কিশোর সালুকুশ নামের এক ওড়িয়া ছেলে আর কাট্টু সিং নামে কার্মাটোরের একটি ছেলে নিযুক্ত হয়। আপনজন কেউ কাছে না থাকায় কবির পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী স্ত্রীই রান্না-বান্নার দায়িত্ব সামলাতেন। পক্ষাঘাতে তাঁর নিম্নাঙ্গ অবশ হয়েছিল, কিন্তু উর্ধাঙ্গ সক্ষম ছিল। তাই, পরিচারকরা জিনিসপত্র গুছিয়ে দিলে তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়েই রান্না করতেন। কবির জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে যাওয়ায় ভালো ক'রে খেতেও পারতেন না।

বাংলার জনপ্রিয় কবি নজরুলের এক সময় যাঁরা খুব কাছের মানুষ ছিলেন, যাঁরা নিজেদের স্বার্থে নজরুলকে ব্যবহার করেছেন, সেই বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক

...হেব, মুসলিম সমাজের মান্যগণব্যক্তি শিক্ষা মন্ত্রী ...মিজুদ্দিন খান, খাজা নাজিমুদ্দিন, সোরাওয়ার্দি, আক্রম ...ন এঁরা কেউই অসহায় নজরুলের পাশে দাঁড়াবার ...বকাশ পান নি। শুধুমাত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আর ...য়েকজন কবিবন্ধু তাঁর পাশে থেকে চিকিৎসার চেষ্টা ...লিয়ে গেছেন। অসুস্থতার প্রথমাবস্থায়, যখন কবির ...াধ-শক্তি বজায় ছিল, তখন আশা করতেন, মধুপুরে ...য়ে কিছুদিন বিশ্রাম নিলেই সুস্থ হয়ে যাবেন। ডাক্তারেরও ...মনটাই পরামর্শ ছিল। শ্যামাপ্রসাদ ব্যবস্থা ক'রে দেওয়ায় ...বি মধুপুরে যান। কিন্তু, দুই মাসেরও বেশি সময় ...খানে কাটিয়ে এলেও কবি সুস্থ হতে পারলেন না।

১৯৪২ সালের শেষ দিকে কবি নজরুল বোধশক্তি ...রিয়ে ফেললেন। লেখার শক্তি, বলার শক্তি হারিয়ে ...ললেন। শিশুর মতো, পাগলের মতো আচরণ করতে ...কেন। তাই, একটা ঘরে আটকে রাখার ব্যবস্থা হয়। ...খালেখি বন্ধ, সভাসমিতি বন্ধ, HMV -এর কাজকর্মও ...। তাই. রোজগারও বন্ধ হয়ে যায়। এমন মানুষের ...রিবার চলবে কী করে। চিকিৎসার খরচতো দূরের কথা, ...খ অন্ন জুটবে কিভাবে। কবি পরিবারের অসহায়তা ...য় HMV কোম্পানি নজরুলের গানের সত্ত্ব হিসেবে ...ছু টাকার ব্যবস্থা ক'রে দেয়। বন্ধু হায়দারের উদ্যোগে, ...মাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে 'নজরুল সাহায্য ...মিটি' নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি বিভিন্ন ...নের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ ক'রে মাসে ২০০্ টাকা ...রে নজরুলের পরিবারকে দিত। পাঁচ মাস এভাবে ...হায্য করার পর কোনো কারণে কমিটি ভেঙে যায়।

নজরুল পরিবারের আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য ...৩.৫.৪৩ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় সাহায্য প্রার্থনা ...রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। তাতে কিছু মানুষ সাহায্যের ...ত বাড়িয়ে দেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে থেকে অবিভক্ত ...লা সরকার নজরুলের জন্য মাসিক ২০০্ টাকা ...হিত্যিক ভাতা দেবার ব্যবস্থা করে। স্বাধীনতা লাভের ...র প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু কবি পরিবারের জন্য ...০্ টাকা এবং দুই পাকিস্তান মিলে সাড়ে তিন শত ...া সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্যোগে ...দেশে নিয়ে গিয়ে নজরুলের চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়। ১৯৫৩ সালের ১০ই মে নজরুল ও প্রমীলাকে ইংলন্ডে পাঠানো হয়। ভারত সরকার এই চিকিৎসার জন্য দেয় ২,৫০০্ টাকা, পাকিস্তান দেয় ৬০০০্টাকা। লণ্ডনে ৬ মাস চিকিৎসা চলার পর কিছুদিন ভিয়েনায় থাকেন। কিন্তু রোগ নিরাময়ের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। ব্যর্থ হয়ে কবি ও কবিপত্নীকে ফিরে আসতে হয় কলকাতায়।

কলকাতাতেই অসুস্থ নজরুলের অনেকগুলি বছর কেটে যায়। এই অক্ষম বোধহীন, অসুস্থ, নির্বাক কবিকে নিয়েও অনেক রাজনীতি হয়ে গেছে। মুসলমান কবি এদেশে খুব কষ্টে আছেন, তাঁর সেবা-যত্ন হয় না, তাই, পাকিস্তান সরকার তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানে নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু ভারত সরকার তাঁকে পাশপোর্ট দিল না। পরে ১৯৭১ সালে নতুন রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ' হবার পর প্রথম প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমানের আবেদনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নজরুকে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। ১৯৭২ সালের ২৪শে মে, বিমানযোগে নির্বাক নজরুল পৌঁছলেন বাংলাদেশের ঢাকা শহরে। কবি নিজে হয়তো কিছুই বুঝলেন না।

বাংলাদেশে নজরুলের যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছিল; একটা বেশ সাজানো-গোছানো ভালো বাড়ি কবিকে পরিবার সহ থাকবার জন্য দেওয়া হয়েছিল। সর্বশ্রেণীর মানুষ নজরুলকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। পৌঁছানোর দিন তাঁকে দেখবার জন্য প্রায় ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) নারীপুরুষ পথের ধারে অপেক্ষা করেছিল। বহু সংবাদ পত্রে নজরুলের বাংলাদেশে পৌঁছানোর খবর প্রকাশ হয়েছিল। জাতীয় কবির সম্মান নিয়ে মর্যাদার সঙ্গে ভালোভাবে থাকবার জন্য বাংলাদেশ সরকার নজরুলের জন্য ১০০০্ টাকার মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করে। এছাড়াও সাহিত্য অ্যাকাডেমির ৫০০্ টাকা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৩০০ টাকা মাসোহারার ব্যবস্থা করে। তখনকার দিনে মোট ১৮০০্ টাকায় নজরুলের পরিবারের ভালোভাবেই চলবার কথা। কিন্তু যাঁর জন্য এত টাকার ব্যবস্থা, 'কবি ভবনে'র ব্যবস্থা, তিনি যত্ন এবং সম্মানের সঙ্গে দিন কাটাতে পারছেন কিনা, সে সন্দেহ অনেকের মনেই জেগে উঠল।

বাংলাদেশ সরকার শুধু 'কবি ভবন' নামের বাড়ি

আর মাসোহারা দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেনি, বাংলাদেশের সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের কাছে কবিকে প্রদর্শন করবার জন্য কবিকে সাজিয়ে গুছিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাও করে। টাঙ্গাইল, নারায়ণগঞ্জ, প্রভৃতি অঞ্চলেও নির্বাক কবিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সভাসমিতির ব্যাপার-স্যাপার বোঝার ক্ষমতা কবির ছিলনা। কিন্তু শান্তশিষ্ট শিশুর মতো চুপ ক'রে বসে থাকতেন। মনে হতো, সভায়, বহু মানুষের সামনে বসে তিনি খুশিই হয়েছেন। বাংলাদেশে গিয়ে কবি হয়তো বেশ সুখেই ছিলেন। কিন্তু, এ সুখ তাঁর বেশিদিন কপালে সয়নি। শেষদিকে আপনজন কেউ কবির কাছে থাকেন নি। স্ত্রী প্রমীলা বহুদিন আগেই (১৯৬২-র ৩০ শে জুন) মারা গিয়েছেন। প্রমীলাদেবীর মা নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছেন, পুত্র অনিরুদ্ধ মারা যান ২২.২.১৯৭৪ তারিখে, সব্যসাচীর পত্নী উমাকাজী অন্য একজনকে বিবাহ ক'রে রিজিয়া মালিক নামে অন্য সংসারে চলে গেছেন। আর পুত্র সব্যসাচী নিজের কাজের তাগিদে কলকাতায়। সেবা-যত্নের অভাব হচ্ছে বুঝেই বাংলাদেশ সরকার কবিকে ভারতে পাঠাতে চান, কিন্তু সব্যসাচী তাতে রাজি হননি।

সরকারি সিদ্ধান্তে হঠাৎই একদিন নজরুলকে কবি ভবন থেকে পি.জি. হাসপাতালের কেবিনে নিয়ে যাওয়া হ'ল। কবি যে অসুস্থ হয়েছিলেন, তা' নয়, তবুও তাঁকে নিয়ে যাওয়া হ'ল এবং 'কবিভবন' সিল করে দেওয়া হল। জানা যায়, কবির সেবা-যত্নের জন্য যে ১৮০০্ টাকা দেওয়া হত, তা শুধু কবির সেবা যত্নেই ব্যয় হত না, অন্য কয়েকজনের পকেটেও যেত। এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল। কারণ, যার জন্য টাকা আসত, তিনি তো তখন টাকার মর্মই বুঝতেন না, একটা পয়সাও হাতে নিয়ে দেখতেন না। সে টাকা এসে পড়ত অন্যদের হাতে।

হাসপাতালের কেবিনে ডাক্তার আর নার্সদে তত্ত্বাবধানে নজরুল যে ভালো ছিলেন, এ কথা বলা যা না। চিকিৎসা আর সেবার হয়তো অভাব ছিলনা; কি খোলামেলা পরিবেশে বেড়ানোর স্বাধীনতা ও সুযো তো হাসপাতালের কেবিনে থাকার কথা নয়। তাই, কি একটা অপ্রাপ্তির বেদনায় কবি কষ্ট পেতেন। হাসপাতালে কেবিন। ডাক্তার, নার্স — এসব একটা শিশুর মতো কবির কাছে বাঞ্ছিত ছিলনা। কিশোর সালুকুশা ছাড়া চে মুখের মানুষ কবির সামনে কেউ আসতেন না। শিশু মতো যাঁর আচরণ তিনি অচেনা পরিবেশে, অচে মানুষদের মধ্যে ভালো থাকবেন কী ক'রে? তাই, ক্র শরীর, মন খারাপ হ'তে থাকল। ডাক্তারদের চিকিৎ নার্সদের যান্ত্রিক সেবাকে তুচ্ছ ক'রে, নিরাসক্ত ক ১৯৭৬ এর ২৯শে আগষ্ট, রবিবার সকাল পৌনে দশ (বাংলাদেশের সময় ১০টা ১০ মিনিট) নাগাদ চিরবি গ্রহণ করলেন।

সম্বিৎ হারাবার পর দুই রাষ্ট্রের মানুষ নজরুলকে নি কী ভেবেছেন, কী করেছেন, কতটা সম্মান, কতগু খেতাব দিয়েছেন, তা নিয়ে নজরুল কোনো প্রতিক্রি জানাতে পারেননি। যে মানুষটা একদিন বলেছিলে —"বিদ্রোহী রণক্লান্ত/ আমি সেই দিন হব শান্ত/ য উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে ন অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীমরণভূমে রণিবে না।/ বিদ্রো রণকান্ত/ আমি সেই দিন হব শান্ত।" — সেই মানুষটা ভাগ্যের প্রতিকূলতায় পীড়িত মানুষের মহা সংকট কালেও একটা কথা বলতে পারলেন না ৩৩-টা ব নির্বাক, নিষ্পৃহ অবস্থায় কাটিয়ে চ'লে গেলেন।

তরুণ ছাত্রসমাজ ও অভিভাবকদের কর্তব্য

তারাপ্রসাদ নরসুন্দর

দেশের তরুণ সমাজ ও ছাত্রগোষ্ঠী দেশেরই আগামীদিনের বংশ। তারাই মাথা দিয়ে গড়ে তোলে ভবিষ্যতের সুদৃঢ় বুনিয়াদ। এই তরুণ ছাত্রসমাজ ই পারে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী রক্তের প্রবাহ আনতে। তাইতো কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় তাদের আগামীদিনের মাথার প্রদীপ' বলে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু যে ছাত্র সমাজের উপরে নির্ভর করছে দেশের সুদৃঢ় ভবিষ্যৎ তাদের ভবিষ্যতের বুনিয়াদ সুদৃঢ় করতে তাদের পিতা মাতাদের এবং যাদের উপরে সমগ্র জাতির জীবন নির্ভরশীল - পিতা মাতা বা গুরুজনদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ভক্তি যে কতটা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট - সেটাই আমি আমার বক্তব্যে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরছি। অবশ্য অজ্ঞাত কারণ বশত কোনো ভুল - ত্রুটি থাকতেও পারে, তাই প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

বর্তমান যুগ সবচেয়ে বেশি কর্মব্যস্ততার যুগ। তাই নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত সমাজের কর্মব্যস্ত অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের যতই বেশি ভালোবাসেন না কেন, সন্তানদের পাশে থেকে সময় কাটানোর মতো সময় তাদের নেই। কিন্তু কোনো বাবা-মা-ই সন্তানের অমঙ্গল চাইতে পারেন না। সব বাবা-মায়ের কাছে তাদের সন্তান ভালো। কানা হোক, খোঁড়া হোক, কালা হোক, বোবা হোক - তাকে স্নেহ-বাৎসল্যে আগলে রাখেন, তার মঙ্গল কামনা করেন - অর্থাৎ, বাৎসল্যের যে বিজ্ঞাপন হয়না তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু সন্তানের মঙ্গল কামনা বলতে এখনকার অভিভাবকেরা শুধুমাত্র তাদের পড়াশোনার উন্নতিটাকেই বুঝে থাকেন। তাদের সন্তান কি ভাবে ক্লাসে ফার্স্ট হবে এটাই তাদের লক্ষ্য। তাইতো সকালে টিউশন, তারপর স্কুল, বিকালে আবার টিউশন, রাত্রে বাড়িতে পড়া। পাঠ্য পুস্তক 'তোতা পাখির' মতো আউড়ে দিয়ে পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে পারলেই যেন তাদের সন্তান আদর্শবান ছাত্র হয়ে উঠতে পারবে, মানুষের মতো মানুষ হবে।

আপাত দৃষ্টিতে সন্তানের প্রতি অভিভাবকের এরূপ পালন সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু এটা সত্যিই প্রশংসনীয় কি? কেউ যদি আমার মত জানতে চায়, তবে আমার উত্তর অবশ্যই ' না' হবে। একটু অন্তরদৃষ্টি দিয়ে দেখলে আপনারাও আমার মতে সম্মতি দেবেন।

লক্ষনীয় যে, এখনকার অভিভাবকরা চান তাদের সন্তান ক্লাসে ফার্স্ট হোক। কিন্তু তারা কখনো কি চান যে তাদের সন্তান আদর্শবান, নিষ্ঠাবান, চরিত্রবান মানুষ হয়ে উঠুক। আগে শিশুদের কান্না থামাতে মায়েরা শিশুদের হাতে ধরিয়ে দিত কাঠের তৈরী পুতুল, এখন তার বিকল্প হিসাবে মোবাইল অথবা মোবাইলের সঙ্গে আরো দামি - দামি কত জিনিস। যুগের সঙ্গে তালে তাল না দিলে কি সমাজে টেকা যায়, তবে আজকের এই তরুণ ছাত্র সমাজ রসাতলে যাওয়ার জন্য তাদের অভিভাবকরাই বহুল অংশে দায়ি। অবশ্য ছাত্রসমাজ নিজেরাও যে দায়ি তাও স্বীকার করতেই হবে।

এখনকার কর্মব্যস্ত অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের মনে শিক্ষক বা গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি, মান্যতা, বিনয়ভাব, নিষ্ঠা, নম্রতা, উচিত অনুচিতের কথা- এসব বোধ জাগিয়ে তোলার অবকাশই পান না। যেটুকু অবকাশ পান তাতে পাঠ্য প্রশ্ন উত্তরেই মগজ ধোলাই করতে ব্যস্ত থাকেন।

আবার এমন দৃষ্টান্তও লক্ষনীয় যে কম কর্ম ব্যস্ত অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার দিকে নিজেরা মোটেই মনোযোগ দেননা, টিউশন আর স্কুলের শিক্ষকের ভরসাতেই ছেড়ে দেন ('শিক্ষক মানুষ তৈরীর কারিগর'— একথা সত্য, কিন্তু তাঁদের সময় সীমিত। একজন শিক্ষার্থীর প্রথম বিদ্যার্জনের বিদ্যালয় হল তার নিজ আলয়। আর সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হলেন তার পিতা-মাতা; বিশেষ করে মাতা। বৈজ্ঞানিক ও পন্ডিতরা স্বীকার করছেন যে, একজন মা হলেন একশোজন শিক্ষকের

সমান। অর্থাৎ একশোজন শিক্ষক মিলে যা পারেন, একজন মা তা করতে পারেন। তাহলে একজন শিক্ষার্থীর কাছে তার মায়ের অবদান যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা এখানে স্পষ্ট।

তবুও বহু শিক্ষার্থীর মা সন্তানের পড়াশোনার দিকে মন না দিয়ে টিভি দেখে অথবা পাড়ার দিদিদের নিয়ে শ্বশুড়-শ্বাশুড়ির সমালোচনায় ব্যস্ত থাকেন; বহু শিক্ষার্থীর বাবাকে দেখা যায় অবসর সময়ে তাস বা মদের আসরে বসে সময় কাটান। আমি একবার এমনই এক অভিভাবকে তাঁর কর্তব্যের কথা জানাতেই তিনি বলেন —'মাথামোটার দ্বারা কিছু হবে না।' এর উত্তরে আমি বলেছিলাম - 'সকালের আকাশ দেখে কি বলা যায় বিকালে সত্যিই ঝড় উঠবে কিনা?'এর অর্থ তিনি কতটা বুঝতে পেরেছিলেন তা আমার জানা হয়নি, তবে আপনারা নিশ্চয় পেরেছেন।

তবে ছাত্রসমাজও যে ধোয়া তুলসিপাতা নয়, তাও স্মরণে রাখতে হবে। পড়াশোনার সাথে সাথে সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে ছাত্র সমাজকেই যে এগিয়ে এসে সমাজের হাল ধরতে হবে তার ন্যূনতম জ্ঞানটুকুও ছাত্রসমাজ আজ হারিয়ে ফেলেছে। সামান্য মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম তারা আজ করতে চায় না। ক্যালকুলেটর হাতে থাকায় সামান্য যোগ-বিয়োগ- ভাগ-গুণটুকুও খাতায় ক... না; তেমনি যানবাহন ছাড়াও এক পা চলে না।... ছাত্রসমাজ গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি, মান্যতা, বি... প্রভৃতি নৈতিক বোধজ্ঞান শূণ্য হয়ে পড়েছে। ... স্কুলে যেতে না যেতেই ছেলে মেয়েরা পরস্পর পর... প্রতি আকৃষ্ট, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রভৃতি কা... সহজে আকৃষ্ট হয়ে বর্তমান ছাত্রসমাজ যেন তাসে... মতো ভেঙে পড়ছে।

তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়া এই ছাত্রসমাজকে রক্ষা করতে হলে, দেশের ভবি... করতে হলে ছাত্র সমাজের মধ্যে গুরুজনদের প্রতি ভক্তি, নম্রতা, মান্যতা, বিনয়ভাব, ভদ্রতা, পাপ... এটা করতে নেই-ওটা করতে নেই ইত্যাদি উচিত-অ... কথা, সমাজের প্রতি তাদের কর্তব্য ইত্যাদি শুভ... জাগিয়ে তুলতে হবে। আর এ ব্যাপারে ... মা-বাবাকেই প্রধাণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। মা-বাবাই শিক্ষার্থীর প্রকৃত শিক্ষক। মাননীয় ড... বিশ্বাস মহাশয়ের মতে "যেকোনো মানুষের বে... এবং আদর্শবান মানুষ হয়ে ওঠার ... বাবা-মা-গুরুজনদের অবদানই সবচেয়ে বেশি।'

হীরালাল ভকত কলেজের জাতীয় সেবাপ্রকল্পের শোভাযাত্রা।

মন চলো যাই আনন্দ নিকেতনে

বিমল পালন
সহযোগী অধ্যাপক (বাণিজ্য বিভাগ)

প্রাণীকুলের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ, কারণ, অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল তার মন। মন নিয়েইত মানুষের জীবনের দোলাচল; তার জীবন দর্শন, মনন, মননের লালন একটি পরিপূণ অভ্যন্তরীন কার্যকলাপ, যার ফলে আজ মানব সভ্যতা যুগ যুগ ধরে আমাদের শেখায়, অচেনার আনন্দ উপলব্ধি করতে, আমরাই পারি; আর কোন প্রাণীসমাজ এতটা বোধসম্পন্ন নয়। আমাদের জীবনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সর্বাঙ্গ সুন্দর মন তৈরি করা। কিন্তু প্রশ্ন হল, সর্বাঙ্গ সুন্দর মন তৈরি করা অতি সহজ কাজ নয়। যে পরিবেশে মানুষ বসবাস করে, সেই পরিবেশই তার মন তৈরি করতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। বোধ হয় পরিবেশগত বিভিন্নতার জন্যই এক এক অঞ্চলে মানুষের মনের মধ্যে কিছুটা তারতম্য দেখা যায়। তারতম্যে পার্থক্যের জন্য অবশ্যই আমাদের সমাজের আর্থসামাজিক বৈষম্যও মনের লালনপালনের বিভিন্ন দিক নির্দেশ করে।

তাই আজ এই নিবন্ধের মাধ্যমে মনের নানা আঁকাবাঁকা গুলির ভিতরে ক্রীয়াশীল বস্তুগুলি নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করব। আজকের দিনের মা-বাবারা বা পূর্বেও তারা সন্তান-সন্ততির সুখী জীবন গড়ে তোলার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করেন, সন্তানদের উপর ভীষণ চাপ সৃষ্টি করেন। কিন্তু এ কথাতো ঠিক যে, ক্লাসের মোট ৮০টি ছেলে বা মেয়ের মধ্যে প্রথম হবে একজনই। কিন্তু সেই বোধ তুচ্ছ করে প্রত্যেক মা-বাবাই চেষ্টা করেন যেন, তার পুত্র বা কন্যা প্রথম হয়। এই দিশাহীন উচ্ছাশার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই জেনেও কিন্তু মা-বাবারা এরকম আচরণ করেন। এই কারণেই বাচ্চা ছেলে মেয়েগুলির জীবন দুর্বিষহ; যন্ত্রবৎ, প্রাণহীন এবং বোধহীন শিক্ষিত পড়ুয়া হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় অভিভাবকগণ ভুলে যান তার সন্তানের মনের ইচ্ছা, লিপ্সা, ভাললাগা বা লালসা কোন কিছুতেই ভাবনার মধ্যে আনেনা। কিন্তু এ কথা আমাদের মানতেই হবে শিশুর বা ছাত্র-ছাত্রীদের মনের দিকে লক্ষ্য না রেখে বা তার মনটাকে সুন্দর করে গড়ে না তুলতে পারলে ভবিষ্যতে একটিও সুন্দর মনের ও হৃদয়ের মানুষ আমরা পাব না। স্বার্থান্বেষী শিক্ষিত মানুষ কিলবিল করবে যারা প্রান্তিক মানুষজনদের দুর্দশার কথা, তাদের দৈন্যতা কিংবা তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে চলার কথাও মনে রাখবে না। ভবিষ্যত সমাজ আমাদের দিকেই অর্থাৎ বাবা-মা এর দিকে আঙুল তুলে বলবে তোমরাই আমাদের "মানুষের মতো মানুষ" তৈরি করতে চাওনি, শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ পূরণ করার অছিলায় আমাদের মনের ইচ্ছাগুলোকে গুড়িয়ে, দুমড়ে মুচড়ে আমাদের মনটাকেই হত্যা করেছে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠবে কেন আমরা এই গ্লানি বহন করব? সচেতন ভাবেই শিশু বা ছাত্র বা ছাত্রীর মনের গভীরে প্রবেশ করে, ক্ষেত্র বিশেষে একটু মিলকরণ (Adjustment) করে তাদরে জীবনকে আনন্দময় ও সংবেদনশীল করে তুলতে পারলেই বোধহয় এই গ্লানি থেকে রেহাই পেতে পারি।

জীবনের যাত্রাপথ ঃ

শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য - এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথে আমার একেকটি পর্বে ভিন্নরকমের শিক্ষাদীক্ষা মনন এবং সর্বোপরি আনন্দময় জীবনের ভিন্নভিন্ন দুঃখ, কষ্ট, কঠিন শ্রমের মাধ্যমে অতিক্রম করে জীবনের ফুলটিকে বর্ণময় ভাবে ফুটিয়ে তুলতে থাকে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যদি যাপনের এই ফুলটিকে আরো রঙীন বর্ণচ্ছটায় রাঙিয়ে যেতে পারি তাহলেই জীবন সার্থক।

শৈশবের অনাবিল আনন্দ বয়ে আনে পরম তৃপ্তি। সকলের ভালবাসা শিশুর জীবনকে গড়ে পিঠে উঠতে প্রভূত সাহায্য করে। শিশু বয়সে সকল স্মৃতিকথা মনে না থাকলেও কিছু কিছু ঘটনা মুহূর্ত তার জীবনে চিরস্থায়ী ছাপ ফেলে। এই পর্বের মধ্যে সে মা, বাবা, অন্যান্য নিকটাত্মীয়, পাখী, কীট, পতঙ্গ, গাছপালা, সূর্য, চন্দ্র, তারা প্রভৃতি দেখে দেখে তার শিক্ষার সূচনা হয়। এই শিক্ষা খুবই আনন্দময়, কারণ সে নিজে নিজে দেখে, কেউ শিক্ষা

দেয় না। প্রশ্ন না করায় তার মন আরো উদার হয়ে উঠতে থাকে, আরো দেখতে চায়, আরো জানতে চায়। প্রথম চার কিংবা পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত প্রথাগত পড়াশোনার বেড়াজালে না জড়ানোই সবচেয়ে ফলদায়ী। শিশুর মন তখনই বিষময় হয়ে উঠতে থাকে যখন তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইংরাজী, অংক, বাংলা ইত্যাদি বিষয়গুলি পড়তে হয়। সেখানে না থাকেকোন আনন্দ না থাকে জানার তীব্র ইচ্ছা। যান্ত্রিক ভাবে মা-বাবার চাপে সে পড়ে চলে, কিছু বলতে পারে না। আনন্দময় মনটা কিন্তু আস্তে আস্তে ভেঙে যায়। এটা বদলাতে পারে একমাত্র আনন্দদানকারী, মনের তৃপ্তি সহ... শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে।

কৈশোর কাল হল দুরন্ত, প্রাণময়, উচ্ছল, গতিশীল এবং বয়ঃসন্ধিকাল এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময় পর্বে ভালবাসা, আনন্দ পাওয়া এবং অজানাকে জানবার এক তীব্র অনুভূতি হয়। এই বয়স সন্ধিকালীন সময়ে সবকিছু আস্তে আস্তে একটি মাত্রা পায়। কারোর গান গাইতে ভালো লাগতে পারে, কারো আবার নৃত্যের প্রতি আগ্রহ দেখা যায়, গল্পের বই পড়তে ভালোলাগে কিংবা আঁকতে, কারোর আবার শুধুমাত্র খেলা, আবার কারো কোন কিছুতেই ভাল লাগতে নাও পারে। এই জটিল সময় পর্বটাকে পিতা-মাতাকে অনেক বেশী নজর রাখতে হয়, সহনশীল হতে হয়, বুঝেশুনে কথা বলতে হয়। "আমাকে আমার মত থাকতে দাও" এই জাতীয় কথাবার্তাও শোনা যায়। খারাপ কথা নয় বরং স্বাভাবিক। কিন্তু কেন? এর বৈজ্ঞানিক উত্তর হল এই সময়ে ছেলে-মেয়েদের মস্তিষ্কে বিভিন্ন ধরণের হরমোন এবং ইস্ট্রোজেনের ক্রিয়া ও বিক্রিয়া। এই গ্রন্থিনালীর (Endocrinc) ক্রিয়া-বিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী এবং এটাকে রোধ করা যায় না। জীবনের গতিপথ নির্ণায়ক এই সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং একই সংগে মন খারাপ লাগার সময় আসে, নিজেকে নষ্ট করতে (Spoiled) ইচ্ছা জাগে। সমস্যাগুলোকে সামলাবার মূল হাতিয়ার কিন্তু সেই সুন্দর এবং একটি সংবেদশীল মন এবং মনন। অর্থাৎ আমি যদি ভাল কিছু বিষয় নিয়ে ভাবতে থাকি তাহলে ঐ গ্রন্থীনালীর রস নিঃশরণ যেটি হতে থাকে মস্তিষ্কে তার সুপ্রভাব ফেলে মনের মধ্যে যার জন্য কেউ ভালো গান গায়,কেউ নৃত্যপটিয়সী হয়, কেউ ভালো খেলোয়াড়ে পরিণত হয়, আবার কেউ পড়াশোনায় মনোযোগী ছাত্র বা ছাত্রী। মনের [illegible] (MindSet) তার লালন অর্থাৎ ভালো কাজের মাধ্যমে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া বা বিস্তারিত (Dissimina[illegible] করার মাধ্যমে গ্রন্থিঃ ক্ষরণের সুপ্রভাব পড়ে মনের অভ্যন্তরে। এই ভাবেই কৈশোরের সমস্যাগুলোকে সহজে মোকাবিলা করে জীবনকে একটি নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করা যায় সুন্দর মননশীল মনের মাধ্যমে। যেটি [illegible] সংগে হবে মানবিক হৃদয় সর্বস্ব এবং মনের আনন্দ অক্ষুন্ন রেখে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মকান্ডে নিজেকে লিপ্ত করে।

একটি বাক্য মনে পড়ছে "বার্ধক্যে বারাণস্য" অর্থাৎ বয়স হয়ে গেছে আর সংসারে না, এবার চলে [illegible] কাশীবাসে। ভ্রমণের জন্য কাশীগমন মোটেই আপত্তি জনক নয়, কিন্তু বার্ধক্যে পৌঁছে গেছি বলে কাশী[illegible] মোটেই যুক্তিপূর্ণ নয়। জীবন থেকে পালিয়ে [illegible] যেখানেই যাননা কেন আপনি কি মনের আনন্দে থাকতে পারবেন? এখনো তো অনেক কাজ বাকী রয়ে গেছে বার্ধক্যের জীবনটাকেও আপনি সমান আনন্দময় করে তুলতে পারেন যদি আপনি মনটাকে সঠিক ভাবে চিন্তা[illegible] পারেন। আপনি শিক্ষিত এবং সুন্দর মনের মানুষ। [illegible] ভাবুনতো দেশের কত মানুষ অল্পশিক্ষিত, নিরক্ষর, [illegible] করে পেটের ভাত জোটাতে পারেনা। তাদেরও এক[illegible] মন আছে বটে, কিন্তু মনের আনন্দের অনুভূতি নে[illegible] তাই শেষ জীবনের কাজ হল আপনি আপনার মনের আনন্দকে বিলিয়ে দিন অনেকের মাধ্যমে একটি আনন্দপূর্ণ সমাজ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে।

ত্যাগের মাধ্যমে মনের আনন্দ ঃ

অন্যের জন্য কিছু ত্যাগ করা একটি মহৎ গুণ। [illegible] গুণের অধিকারী আমরা সকলেই হতে পারি, কিন্তু তা[illegible] জন্য চাই আন্তরিক ইচ্ছা। The art of joyous living বা আনন্দময় জীবনযাপনের কলা বা The art of sacrifice অর্থাৎ ত্যাগের জন্য কলা বা কৌশল কিং[illegible] The art of giveupness ছেড়ে দেওয়া বা পরিত্যাগের কলা কৌশল প্রভৃতি শব্দ গুচ্ছের অন্তর্নিহিত অর্থ [illegible] আমাদের মনকেও সুন্দর সাবলীল ভাবে ভাবতে শেখায়

যে শুধুমাত্র নিজের জন্য নয়, অপরের হিতে কিছু করার জন্য আমাদের মনে যায়গা আছে এবং এই কাজের জন্য মনে মনে আমরা তীব্র আনন্দ উপভোগ করতে পারি। এতে আমাদের মস্তিষ্কে হরমোন এবং অন্যান্য গ্রন্থি রসের ক্রীয়া বিক্রিয়া ঘটে আমাদের মনে সুপ্রভাব সৃষ্টি করে। এই ত্যাগের মহিমা আমরা সকলেই ইতিহাস পাঠকরে বুঝতে পারি। মহামতি অশোক ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন এবং থাকবেন কেননা তাঁর জীবন দর্শন অনুভব করে বুঝতে পারি বিভিন্ন সময় তার মনের কী তীব্র দোলাচল হয়েছিল। সাম্রাজ্য বিস্তারের নেশায় কলিঙ্গ যুদ্ধও তিনি জয়ী হন। কিন্তু তার মনের ভাবাবেগ তীব্র অনুশোচনায় জর্জরিত হল। প্রথমে তিনি চন্ডাশোকে আবদ্ধ ছিলেন কিন্তু যুদ্ধের রক্তপাত, বিপুল সংখ্যক নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মৃত্যু এবং সম্পত্তি বিনাশে তার মনের মধ্যে তীব্র অনুশোচনায় দগ্ধ হন। মনের এই গ্লানি থেকে রক্ষা পাবার জন্যই পরবর্তীকালে ধর্মাশোকে পরিণত হন। তার পরের কথা তো ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। জীবনের গতিপথ সম্পূর্ণ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলেন তার প্রজ্ঞার মাধ্যমে। রাষ্ট্রের কল্যাণে, মানব কল্যাণে, শান্তি-প্রীতির প্রচারক হয়ে উঠলেন। প্রজাদের সুখ-দুঃখের সাথে নিজেকে আত্মিক ভাবে জড়িয়ে ফেললেন। ক্রমশঃ ত্যাগের নেশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমস্ত ধন সম্পত্তি স্বেচ্ছায় বিলিয়ে দেন প্রজাসাধারণের দুঃখকষ্ট লাঘব করার উদ্দেশ্য নিয়ে। সম্রাট অশোকের এই আত্মত্যাগকে স্মরণ করেই ভারতবর্ষের সরকার সরকারী সব কাজেই অশোক স্তম্ভের নিদর্শন আমরা দেখতে পাই। এর থেকে আমরা যে শিক্ষা লাভ করি তা হল মন আমাকে কোন খারাপ কাজের জন্য উত্তেজনা সৃষ্টি করলেও মনের দোলাচলে ভাবিত হয়ে সেই মনকেই আমরা নিয়োজিত করতে পারি কোন জনহিতকর মানব কল্যাণের কাজে। এর চেয়ে পরমানন্দ, তৃপ্তি আর কিসে হয়?

প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের জীবনযাপন কলা ঃ

পরমপ্রিয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষিদের কথা আমরা যত পড়ি ততই অবাক হয়ে ভাবতে থাকি, কী মন্ত্রে তারা এতটা বলীয়ান হতে পেরেছিলেন? "যত মত তত পথ" রামকৃষ্ণের এই মতবাদ আজকের দিনেও কত প্রাসঙ্গিক। তিনি তার মনের দুয়ার খুলে অপূর্ব এক সম্মোহনী ক্ষমতায় সকলকেই ভালবাসতেন এবং আপন করে নিতেন। মদ্যপ গিরিশ ঘোষকে নাট্যজগতে স্বমহিমায় ফিরিয়ে এনেছিলেন। নটীবিনোদিনীর কথাতো আমরা সবাই জানি। অন্ধকারময় জীবনের পেশাকে সম্মান জানিয়েও বিনোদিনীকে নাট্য জগতে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছিলেন সদা হাস্যময় ও সরল মনের মানুষ। নিজের মন দিয়ে তিনি অপরের মনের অন্তঃস্থল দেখতে পেতেন। বিবেকানন্দের বাণী "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"। বিবেকানন্দের ঈশ্বর হল ভারতবর্ষের অগণিত নিপীড়িত মানুষ যাদের দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য অন্যদের উদ্দীপিত করে গেছেন। তাঁর স্বল্পকালীন জীবনে (৩৯ বৎসর) আনন্দের সঙ্গে যে যে কাজ করে গেছেন, দীর্ঘস্থায়ী জীবনকালেও আমরা কি সেই রকম সুদুরপ্রসারী কোন ছাপ রেখে যেতে পারব?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনগাথা স্মরণ করে আমরা বিস্ময়ে শুধু ভাবি আর ভাবি কী করে একটা মানুষ একটা ছোট জীবনকালে বিভিন্ন পর্বে কী সুন্দর ভাবে মন ও মননের মাধ্যমে আনন্দময় জীবন কাটিয়ে গেছেন মনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে অবগাহন করে কবিতা, গান, প্রবন্ধ, গল্প, কাব্য, নাটক এমনকি বিজ্ঞান বিষয়ের উপর তার ভাবনা চিন্তা ছিলো যুগোপযোগী। আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথের যে কথোপকথন তার মধ্য দিয়ে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের যোগসূত্র এবং ভাবনা এক অতি বিস্ময়কর সৃষ্টি যা আমাদের অন্তরে প্রবেশ না করে মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ সুখ ও দুঃখকে জয় করে মনের ডানা মেলে নিজে আনন্দ পেয়ে অপরকেও আনন্দ ও ভাবনার খোরাক যুগিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত থেকেও আমরা যদি কিছু ভাবনার এবং আনন্দমুখর সৃষ্টির সংগে লিপ্ত হতে পারি, তবে আমাদের মন, মনন, মননশীলতায় মানবিক কল্যাণময় কোন কর্মকান্ডে যুক্ত হতে পারব। অন্যদিকে আইনস্টাইনও তাঁর বিজ্ঞান গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে বেহালা বাদনের মাধ্যমে মনকে আনন্দময় করে তুলতেন এবং অনুপ্রাণিত হতেন আরো নূতন কিছু আবিষ্কারের জন্য।

শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যেও মনের একটি যোগাযোগ রক্ষা করা উচিৎ। ছাত্রদের মন বুঝতে পারলে শিক্ষকরাও উদার মনে শিক্ষা দিতেন। কিন্তু সেই শিক্ষা শুধুমাত্র পাঠক্রমের মধ্যে সীমিত থাকবে না। অন্যদিকে ছাত্ররাও শিক্ষকদের মন বুঝে নিয়ে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন করবে, আরো অতিরিক্ত কিছু জানার চেষ্টা করবে, তাহলেই শিক্ষায় আমাদের সকলের আনন্দময় মুহূর্ত ও মূর্ছনার সৃষ্টি করে আমাদের মনকে আরো বেশি সংবেদনশীল করে তুলতে পারবে বলে মনে হয়। বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখক বিভূতিভূষণের নাম আমরা প্রায় সবাই জানি এবং তাঁকে আমরা চিনি মূলত একজন প্রকৃতি প্রেমিক হিসাবে। তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন শুধুমাত্র চোখ নয়, হৃদয়-মনের দ্বারা প্রকৃতির এই অপার ঐশ্বর্যকে অনুভব করার মন্ত্র। ভ্রমণ মানে মন মন ভ্রমণ নয়, মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে অন্তরাত্মার চোখে ভ্রমণই হ'ল প্রকৃত ভ্রমণ। পাড়াগাঁয়ে আল, খাল, বিল, মেঠোপথ ধরে ঘুরে বেড়িয়েও প্রকৃতির নগণ্য অপরূপ জঙ্গলের ভিতর নানারকম ফুল ফল, লতাপাতা, প্রজাপতি এবং অন্যান্য প্রাণী সকলের মধ্য থেকেও সঠিক পথে চালনা করা যায়। যদি পরিপূর্ণ মন ও ইচ্ছা থাকে তাহলে একটি গণ্ডগ্রামে গিয়েও সেখানকার লোকজন, মাটি, বন, পশুপাখী, নদীনালা এবং রাত্রের ঐ অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য রোমান্থন করে আমরা ঋদ্ধ হতে পারি।

মনের এই অপার আনন্দ খুঁজে নেবার অনেক পথ আছে। আমার মন কি চায় তার ওপর নির্ভর করে আনন্দ পাবার আস্বাদ। মন যদি চায় গান, তাহলে গান গেয়েও আমার মনকে আনন্দে মাতিয়ে দিতে পারি। সেইজন্য মনের এই সুপ্ত ইচ্ছাটিকে লালনের মাধ্যমে আমরা যে কোন কাজ করিনা কেন আনন্দের সংগে আমরা সেই কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সফল হ'ব। পড়াশোনার মধ্যেও এই আনন্দ আস্বাদন করা যায়। যে বিষয়ই পড়ি না কেন, তাকে মন দিয়ে ভালবেসে গ্রহণ করলেই সেও আস্তে আস্তে তোমার কাছে ধরা দেবে। আনন্দ ও উৎসাহ ক্রমশঃ বাড়বে, তখন পড়তে অনীহা আসবে না, আষ্টেপৃষ্টে বিষয় নিয়ে আরো নিবিড় ভাবে অধ্যায়নের স্বাদ চেটেপুটে গ্রহণ করতে পারবে। এই কাজ সহজ না হলেও একবার চেষ্টা করে দেখ না কি হয়। মন তোলার জন্য চাই মনের জোর, চাহিদা, জেদ, অধ্যা... এবং তার সংগে অবশ্যই আনন্দ। পড়াশোনা করে আনন্দ যে একবার আস্বাদন করতে পেরেছে তাকে পিছন পানে তাকাতে হয়নি। যে কোন বাঁধা অতি... সে করবেই, কেননা লক্ষ্যটা যে স্থির।

মহাবিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচীর বাইরেও অনেকগুলো ক... থাকে। N.C.C., NSS, বিভিন্ন ধরণের খেলা, সাংস্কৃ... অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া থেকে সব কিছুতে থাকতে... তাহলেই চরিত্র, মন, ইচ্ছা এবং আনন্দ একই... ভাবনার গভীরতাকে বাড়িয়ে তুলবে। কালক্রমে তো... সমাজ সচেতনতা আরো বৃদ্ধি পাবে, সেই সঙ্গেসঙ্গ... জনহিতকর বিভিন্ন প্রকল্পের সংগে যুক্ত হবার ... বাড়বে, তোমার মনের মধ্যে বিবর্তন হতে ... একজন শিক্ষিত আদর্শ সুনাগরিক হবার আকাঙ্খা। ... মহৎ কাজ করে, তার উদাহরণ আমরা পাই ... সাফাই অভিযানে, স্বচ্ছ জল ব্যবহারের জন্য সচে... শিবির করে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার মাধ...

সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি যে একটি ভাবে... গড়ে ওঠার প্রথম স্থান হল নিজগৃহ এবং পিতার... আন্তরিক সাহচর্য, পরে প্রকৃতির উপকরণগুলিকে... ও বোঝা এবং আরো পরবর্তীতে স্কুলে, কলে... বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের আলাপ-আলোচনায় আম... মনকে আরো উদার করে গড়ে তোলার পীঠস্থান চি... প্রাকৃতিক কারণেই মানুষের সৃষ্টি এবং প্রকৃতিই ... রক্ষা করে। জীবনে কোনো গভীর আঘাত, মর্মে... উপশম করার একটি উপায় হল সেই পরিস্থিতিতে... ঠান্ডা রেখে কোন বৃহৎ বটবৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়ে অ... করার চেষ্টা করা যে বটবৃক্ষটি কত রকমের ঝড়, ... রোদ, বৃষ্টি উপেক্ষা করে সে তার নিজের কাজ ... ছায়া সুশীতল পরিবেশ তৈরি করে আমাদের ... রেখেছে। সে তো ভেঙে পড়েনি, আদর্শচ্যুত হয়নি... এই উপলব্ধিটাই মানুষ যখন বুঝতে পারবে তখন... মনটাও আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে অতিমাত্রায় ... হয়ে জীবন পথটাকে আরো রঙীন ও উজ্জ্বল ভাবে ... ধরবে।

ফ্রান্সিস্ ফুকোয়ামা ও তাঁর ইতিহাসের সমাপ্তি তত্ত্ব

সৈয়দ এম. জামান
সহকারী অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)

বিশ্বরাজনীতিতে ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রভাব রাষ্ট্রচিন্তার উদারপন্থী ভাবনার যে বিকাশ ঘটিয়েছে, তারই এক বলিষ্ঠ প্রকাশ হিসাবে উঠে এসেছে ফ্রান্সিস্ ফুকোয়ামার নিস্তরঙ্গ ইতিহাসের তত্ত্ব, যাকে তিনি 'ইতিহাসের সেরা সমাপ্তি' (The end of History) বলে ঘোষণা করেছেন।

বিগত শতাব্দীর নব্বই এর দশকের গোঁড়ায় সাবেক সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ও পতনের সম্ভাবনা যখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং বিশ্বজুড়ে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও আন্দোলনের সংকট প্রকট হয়ে উঠেছে, ঠিক তার কিছুকাল পূর্বে ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে রীতিমতো সাড়া জাগিয়ে 'The National Interest' (Vol-16) পত্রিকায় 'The end of History' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যার লেখক ছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রীয় দপ্তরের ক্যাবিনেট গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য ফ্রান্সিস্ ফুকোয়ামা। ১৯৫২ সালে ২৭শে অক্টোবর তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

উপরিউক্ত গ্রন্থে তিনি বলেন - 'What we may be witnessing is not just the end of clod wr, or the passing of a particular period of postwar history, but the end of history as such, that is the end point, of mankind's ideological evolution and universalization of western liberal Democracy as the final form of human goverment.' এক কথায় উক্ত গ্রন্থে তিনি 'সমাজতন্ত্রের মৃত্যুঘন্টা এবং পুঁজিবাদ তথা পাশ্চাত্য উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বিজয় ঘন্টা বাজিয়েছেন। তিনি বলেন অতীতে যুদ্ধ ছিল পরিবর্তনের প্রধান অনুঘটক, কিন্তু আজ পর্যন্ত উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরস্পরের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ ঘটেনি। যা ঘটেছে তা আসলে উদার পুঁজিবাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, যা সশস্ত্র স্বার্থের সংঘাতকে সম্পূর্ণ ভাবে অভিবিনিষ্ট করেছে। এছাড়াও পশ্চিমী সমাজে তিনি কোন দারিদ্র্য দেখেন না। তাঁর মতে দারিদ্র্য যেটুকু আছে তা বাজারের শক্তির জন্য নয়, তা সৃষ্টি হয়েছে কিছু সংস্কৃতিক অসুবিধাজনিত বাস্তবায়নে এবং তারও ক্রমশ অবসান ঘটবে আধুনিক পুঁজিবাদের পর্যাপ্ত ভোগ্যপন্য উৎপাদনের ফলে বলে তিনি দাবী করেন।

যদিও ফুকোয়ামা মনে করেন না যে 'ইতিহাসের সমাপ্তি' কোন পরিপূর্ণ সমাজের পরিচয় উপস্থিত করে; তথাপি এর কোন ভালো বিকল্প নেই বলেও তিনি মনে করেন। তিনি বলেন ঐতিহাসিকভাবে অগ্রসর দেশগুলির বাইরে হতে জাতীয়তাবাদের বাগাড়ম্বর হতে পারে, কিন্তু বৃহৎ আর্থিক শক্তিগুলি এই জাতীয়তাবাদী লড়াইকে ব্যবসায়িক লড়াই দিয়েই স্তিমিত রাখবে। ধর্মীয় মৌলবাদের আগমন ঘটতে পারে, কিন্তু তার অবস্থান ও হবে পৃথিবীর একটা ক্ষুদ্র প্রান্তে; ইসলামীয় জগতের বাইরে, এর কোন আস্ফালন নেই। এমনকী চীনের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন কমিউনিজমের পতনের পর তার আপাতদৃষ্ট যুক্তিসংগত পাঠান্তর হিসাবে সমাজবাদী গণতন্ত্রের এক ধারা বজায় থাকলেও তাও বাজার অর্থনীতি ও সম্পর্কের উৎকর্ষকে মেনে নিয়েছে। যাইহোক ফুকুয়ামার প্রবন্ধে উঠে এসেছে রাষ্ট্র চিন্তার বেশ কিছু কৌতুহলজনক দিক এবং সেগুলি হল —

১. ইতিহাসের গতি বিবর্তন মূলক এবং তা পৌঁছে গেছে তার সমাপ্তির পথে।

২. এই পর্বে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও পরিচয়কে পাবারও বস্তুনিষ্ঠ যে প্রকৃতিগত লড়াই চলেছে তা পরিপূরণ করতে পেরেছে উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও ধণতান্ত্রিক সমাজ।

৩. মার্কসের ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার মধ্যেই এই ব্যাখার পূর্বস্মৃতি রয়ে গেছে।

ফুকুয়ামা এক্ষেত্রে মার্কসকে হেগেলের পোশাক পরিয়েছেন এবং তিনি আবেদন করেছেন হেগেলের 'ফিনোমেনোলজি'-র (Phenomenology) দার্শনিক ভাষ্যকে বুঝে নেবার জন্য। তাঁর মনেও, হেগেলের

দর্শনের কেন্দ্রীয় ধারনা হল প্রভু ও ভৃত্যের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। অতীতে ইতিহাস ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে কারণ এখানে শুধু প্রভু ও ভৃত্যের পার্থক্য ও লড়াইকেই দেখানো হয়েছে। প্রভুদের যুদ্ধে যাওয়া ও ভৃত্যের কঠোর পরিশ্রম করার বাইরে এদের পারস্পরিক সম্মান এবং ব্যক্তিগত কাজ ও মর্যাদার কোন মূল্য দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে ফরাসী বিপ্লবের নীতি সঠিক ঐক্যের নীতিকে প্রসারিত করেছে। নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার, আইনগত ব্যক্তিত্ব হিসাবে তার মর্যাদাকে মূল্য দিয়েছে মানুষের বাসনা তৃপ্ত হয়েছে,. লড়াই ও পরিশ্রম শেষ হয়েছে, আর কিছু করার নেই।

ফুকোয়ামা যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই পাশ্চাত্ত্য উদারবাদের প্রতি বিশ্বাস শিথিল হতে শুরু করে। এর কারণ এই সময় থেকে উদার ধনতন্ত্রকে সরিয়ে ফ্যাসিবাদ আর সমাজতন্ত্রবাদ এর মতো সামগ্রিকতাবদী দর্শন পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার আসরে গেড়ে বসে। এসময় উদারপন্থী পুঁজিবাদকে স্থানচ্যুত করার চেষ্টা করা হয়। বিশ্বসমাজবাদের ধারনা দিয়ে অথবা এমন একটি বিন্দু অভিমুখী তত্ত্ব (Global Convergenec Theory) দিয়ে যা সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রকে মিলিয়ে এক মধ্যপন্থী অবস্থান নেবে। মধ্যপন্থার এই তত্ত্বে সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক দেশগুলি আসলে ব্যাপক রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক ও সামাজিক জীবনের ওপর বিধিনিষেধের এক ধারণাকে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষে এসে পাশ্চাত্য উদারবাদ পুনরায় তার আত্মবিশ্বাস ফিরে পায় এবং স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ফুকুয়ামা বলেন, এর পর থেকেই বোঝা যায় উদার গণতন্ত্রের যাবতীয় বিকল্প নিঃশেষ হয়ে গেছে।

যদিও ফুকুয়ামা মনে করেন উদার ভাবনার এখনও পরিপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেনি, কিন্তু তিনি এই বিশ্বাসে অটল যে বিকল্প মতাদর্শের অবসান ঘটেছে এবং বিশ্ব ইতিহাসের শেষ বিন্দুতে অবস্থান করছে। তবে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ যে একেবারেরই থাকছে না - একথাও তিনি জোর দিয়ে বলতে পারেননি, কারণ ধর্মীয় মৌলবাদ ও জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিয়েও ফুকুয়ামা মনে করেন বিরোধে লিপ্ত রাষ্ট্রগুলি শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের শেষ বিন্দু বা যুক্তে আটকে থাকবে, তবে বিশ্বকে অতীত বিদীর্ণ করছে সেসব বৃহৎ মতাদর্শগুলি সেগুলির অসিত্ব আর থাকবেনা।

ফ্রান্সিস্ ফুকোয়ামা অবশ্য আমাদের সমব্যাথী হয়েছেন ভবিষ্যৎ শতাব্দীর মতাদর্শগত একঘেয়েমী ও বিরক্তিকর অবস্থার জন্য। ইতিহাসের এই দুঃখজনক পরিস্থিতিতে যেন তিন ব্যথিত। পুঁজিবাদী নিত্যতা নিয়ে তাঁর চিত্ত যেন বিষন্ন। তিনি হতাশ হন এই ভেবে যে মতাদর্শগত সংগ্রামের মধ্যে যে স্বীকৃতি পাবার লড়াই ছিল, এই জড়বাদী লক্ষ্যের আকর্ষণে জীবনদানের যে ইচ্ছা ও ঝুঁকি ছিল। মতাদর্শগত সংগ্রামের মধ্যে যে বেপরোয়া মনোভাব বা মানসিকতা ছিল, কল্পনা ও আদর্শ ছিল, তাকে আজ সরিয়ে দিয়েছে আর্থিক হিসেবী মনোভাবে প্রযুক্তিগত সমস্যাকে সীমাহীন সমাধান, পরিবেশ নিয়ে ভাবনা আর অস্বাভাবিক রকমের ভোগ্যপন্যের চাহিদা। অবশ্য তিনি স্বীকার করেছেন পুঁজিবাদ বিজ্ঞানের সেভাবে বাঁধন মুক্ত করে মানুষের সুখ, সুবিধা ও চাহিদাকে তৃপ্ত করেছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব, তাই তিনি মনে করেন ইতিহাসের শেষ লগ্নে মানুষ রাজনীতির চেয়ে অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাকে নিয়ে বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়বে, তার প্রযুক্তিগত সমস্যার সমাধানে নজর দেবে, আর ভুলে যাবে তার অতীত বীরগাঁথার স্বপ্ন ও সংগ্রামের কাহিনী। তিনি বলে ইতিহাস পরবর্তী যুগে কলা, দর্শন সবই হারিয়ে যাবে . এসবের স্থান হবে মানবিক শক্তির যত্ন নেবার চিরস্থায়ী যাদুঘরে। ফুকুয়ামার বক্তব্য, আমরা যদি এমন একটা বিশ্বের কল্পনা করতে না পারি যা আমাদের বর্তমানের চেয়ে আলাদা, সেখানে আমাদের বর্তমান বিন্যাসের চেয়ে ভবিষ্যৎ মৌলিক অগ্রগতির কোন পথ নেই, তবে তো আমাদের ইতিহাসের সমাপ্তি সংগীত গাইতে হবে

ফুকোয়ামার মতে দক্ষতা, উন্নতি এবং বিরোধের উপর দাঁড়িয়ে থাকা উদারনৈতিক সমাজকে কেউ অগণতান্ত্রিক বলতেই পারেন, তবে অন্যের সমান হতে না চাওয়া বা অন্যের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবা উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মূল নীতিকেই ছোট করে, তবে ফুকুয়ামা এ বিষয়ে আশাবাদী যে উদার গণতন্ত্র তার বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় সমালোচনাকে কাটিয়ে ওঠার সামর্থ্য রাখে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ফুকুয়ামাকে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রচারিত মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক ড্যানিয়েল বেল এর 'End of Ideology' তত্ত্বের সার্থক অনুগামী বলা হলেও তিনি কিন্তু মতাদর্শ শেষ হয়েছে একথা বলেন নি বরং বলেছেন একটি মতাদর্শই টিকে থাকবে এবং সেটি হল উদার গণতন্ত্র। উদার গণতন্ত্রই এই মার্কিন ভাষ্যকারের কাছে শাসনের শেষ যুগ (The Final form of human Government) ।

সমালোচনা ঃ ফুকুয়ামার তত্ত্ব যে অনেক ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট, সংগতিহীন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রথমত ঃ ইতিহাসের ভবিষ্যতের গতি সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন বা ভেবেছেন, তা বাস্তব নয়। পুঁজিবাদী, গণতন্ত্রের প্রতি তার অপার উচ্ছাস দিয়েই তিনি তার আগামী জগতের জাল বুনেছেন। উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা উদার ভোগবাদী সমাজই শেষ বাসা হতে পারে না। বরং বলা যায় অন্তিম মূল্যবোধ নিয়ে লড়াই চলতেই থাকবে।

দ্বিতীয়ত ঃ একথা বলা ঠিক হবে না যে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজবাদের যাবতীয় সম্ভাবনা নির্মূল হয়ে গেছে। মনে রাখতে হবে, ভুল চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক দায়ী হতে পারে, কিন্তু তার জন্য গোটা চিকিৎসা শাস্ত্রকে দায়ী করা যায়না। তাই হেগেল এর দার্শনিকতার আড়ালে মার্কসের অবমূল্যায়ণের চেষ্টা সঠিক হবে না। আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি বাজার অর্থনীতিকে মেনে নিলেও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে চীনের অগ্রগতি কিন্তু থেমে থাকেনি। বরং, উদার অর্থনীতি ও বেসরকারীকরণের চাপে, শেয়ার বাজারের মন্দা ও কেলেঙ্কারীর প্রভাবে পুঁজিবাদ ও তার ভবিষ্যৎ নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

তৃতীয়তঃ ফুকুয়ামার তত্ত্ব থেকে একথা স্পষ্ট নয় উদার ধনতান্ত্রিক সমাজ কীভাবে আমলাতন্ত্র ও কর্পোরেটবাদের ধারা থেকে মুক্ত হয়ে ইতিহাসের শেষ গতি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

চতুর্থত ঃ প্লেটো, হেগেল, স্ট্রস এবং কোজেভ এর নির্ধারণবাদী ভাবনাকে সঙ্গে নিয়ে 'ইতিহাসের সমাপ্তির' যে ধারনাকে তিনি যে মানবচিত্ত নিয়ে ভাবেন সেখানে ফ্রয়েড এর মতো সামাজিক মনস্তত্ত্ববিদের কোন কথা নেই। সমকালের নারীবাদী ভাবনাও তাকে প্রভাবিত করেনা। বিশ্ব পরিবেশবাদ সমাজ ও জীবনের উপর কতটা প্রভাব ফেলেছে ইতিহাসের গতিকে তা কতটা নির্ধারণ করে - এ বিষয়েও তাঁর নীরবতা আশ্চর্যজনক।

ফুকুয়ামার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা পাশ্চাত্য পুঁজিবাদের অসংগতি তাঁর চোখে পড়ে না, অথচ দুর প্রাচ্যের অনুদানও গণতান্ত্রিক ঝোঁক নিয়ে তার চিন্তার শেষ নেই। সোভিয়েত কমিউনিজম শেষ হয়েছে, কিন্তু পুঁজিবাদের মধ্যে যে আত্মহননের খেলা চলছে - এই সম্ভাবনা তাঁর বিচার্যে নেই।

সর্বোপরি উদার গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব ও বিস্তারের কথা যিনি বলেন তিনি বুঝতে পারেন না। পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রের মধ্যে সংযোগ ও বন্ধন কতটা অগভীর ও অনিশ্চিত সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্বে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, একথাও তিনি মানেন না। ধনতন্ত্রের মধ্যেই যে বৃহৎ পুঁজির প্রতিযোগিতা চলছে, ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছে বা মার্কিন আধিপত্যবাদের নেতিবাচক প্রবণতা বর্তমান পৃথিবীর গতি কোন দিকে নিয়ে চলেছে, ফুকুয়ামার সেদিকে নজর নেই। তাই মনের মধে এই প্রশ্নটিই বারে বারে ফিরে আসে ইতিহাসের সমাপ্তি কি সত্যই ঘটেছে? নাকি ইতিহাসের কোন শেষ নেই, ইতিহাস অনন্ত, অবিরাম প্রবহমান। আমার তো মনে হয় 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো তে উল্লিখিত মার্কসের সেই বিখ্যাত ইতিহাস পর্যবেক্ষণকে - 'History of all hitheroto existing society is the History of class struggle' যদি কেউ পুরোপুরি নির্ভুল বলে নাও মানেন, তবু ইতিহাস ছিল, আছে এবং থাকবে।

Environmental Pollution: Sources and Its Impact

Kritiman Biswas
Assistant Professor, Environmental Science,
Hiralal Bhakat College, Nalhati- Birbhum

ABSTRACT

Environment is the sum of substances and forces external to the organism in such a way that it affects the organism's existence. In relation to a man, the environment constitutes of air, land, water, flora and fauna because these regulate the man's life. Environment is a multi-dimensional system of complex inter-relationship in a continuing state of change. Environment, we mean not only our immediate surroundings but also a variety of issue connected with human activity, productivity, basic living and its impact on natural resources such as water, land, atmosphere, forest, habitat, health, energy resources, wild life, etc. The word pollution is derived from a Latin Word polluere which means to soil or to defile. Pollution means an undesirable change in physical, chemical and biological characteristics of air, land and water that may or will harmfully affect the human, animal and plant life.

Keywords: Environment, pollution, environment pollution, Organism, Air, water, land, Resources, Wild life, Particulate, oil spill, Solid waste, Radioactive material, Atmosphere, Habitat.

INTRODUCTION

The effect of Environmental Pollution is not only on India but encompasses the whole world. According to a survey conducted by United Nations the concentration of carbondioxide in atmosphere is now 330 ppm, which is 14% more than the concentration of co2 ten years ago. In India the problem of environment and pollution became an important issue only very recently. But if we trace history we find that concern for the environment has been part of India's social and cultural heritage. The concern for environment in present time found expression in proclamation undertaken to defend and improve the environment for present and future generation by the United Nations Conference on Human environment in Stockholmin 1972.

Diverse range of pollutants such as gases, particulates, agricultural chemicals and radioactive materials in the atmosphere, oil spills, solid wastes on land and water affecting the organisms directly or indirectly. In fact, the pollution has assumed distressing dimensions for the present as well as the coming generations. The governments of almost all countries of the World are forced to pay serious attention to not only conserve and improve the environment but also to prevent it from further deterioration.

ENVIRONMENT

Environment is the sum of substances and forces external to the organism in such a way it affects the organism's existence. In relation to man, the environment constitutes of air, land, water, flora and fauna because these regulate the man's life. Environment is a multi-dimensional system of complex inter-relationships in a continuing state of change.

...nvironment, we mean not only our immediate surrounding but also a variety of issue connected with human activity, productivity,

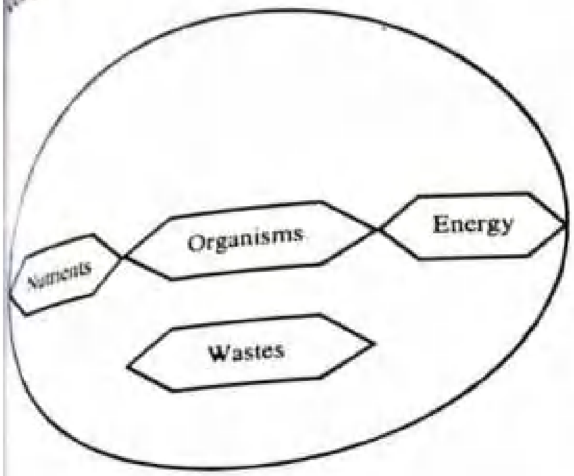

Environment

basic living and its impact on natural resources such as water, land, atmosphere, forest, habitat, health, energy resources, wild life, etc.

POLLUTON

The word pollution is derived from a Latin Word polluere which means to soil or to defile. Pollution means an undesirable change in physical, chemical and biological characteristics of air, land and water that may or will harmfully affect the human, animal and plant life.

CONCEPT OF ENVIRONMENT POLLUTION

Pollution means the presence of undesirable substance in any segment of environment, primarily due to human activity discharging by-products, waste product or harmful secondary products, which are harmful to man and other organisms. But it should be borne in mind that even in natural state no environment component is pure in the scientific sense, there being several admixtures and impurities, but they are insignificant and do not cause appreciable harm. A clear air is a natural mixture of many gases, moistures and particulate matters but when foreign matters are added in significant quantities like oxides of nitrogen and sulfur or lead containing fumes or fluorides etc., air becomes harmful to plants, animals and man directly or through food-chain and thus the air becomes polluted. Environment pollution is now considered as a global phenomenon, which maximally attracts the attention of human being for its sever long term consequences. Over past couple of decades, various sources of pollution were

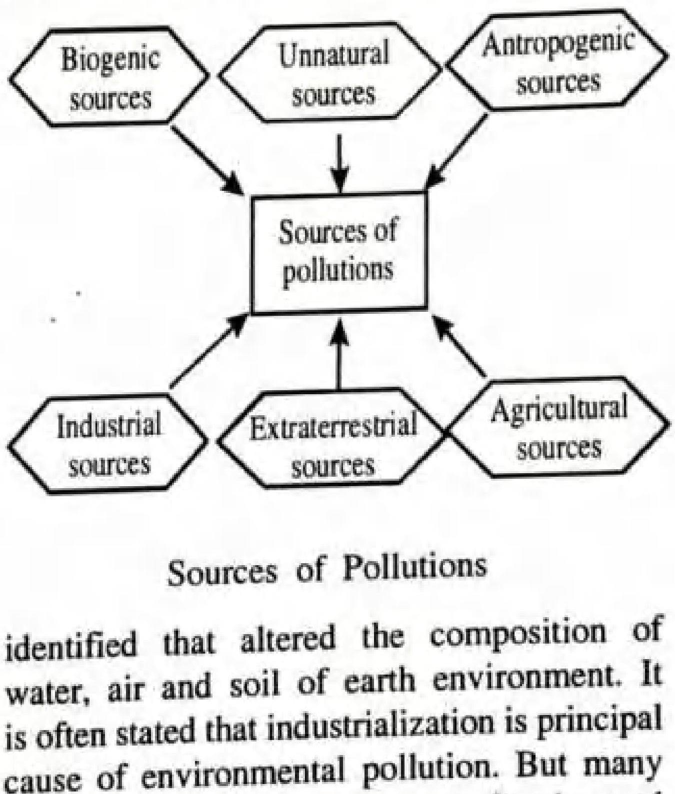

Sources of Pollutions

identified that altered the composition of water, air and soil of earth environment. It is often stated that industrialization is principal cause of environmental pollution. But many other non-specified soures were often ignored earlier. In urban environment, anthropogenic sources of pollutants are considered to have the major significance, while in rural agricultural areas; the agricultural sources are the principal agents as recognizable by the scientific experts.

NATURE AND TYPE OF POLLUTANTS AND POLLUTIONS

A pollutant can be any chemical (toxic metal, radionuclide, organo-phosphorus compound, gases) or geochemical substance (dust, sediment), biological organism, or physical substance (heat, radiations, sound wave) that is released intentionally or inadvertently by man into the environment with actual or potential adverse effects.

Depending on the diversities of pollutan nature, there are four major categori physical, chemical, biological and pollutan of uncertain types. Depending on the natu of pollutants and also subsequent pollution environmental components, the pollution m be categorized under six major types-S pollution, Air/Atmospheric pollution, Wa pollution, Noise pollution, Thermal polluti and radioactive pollution.

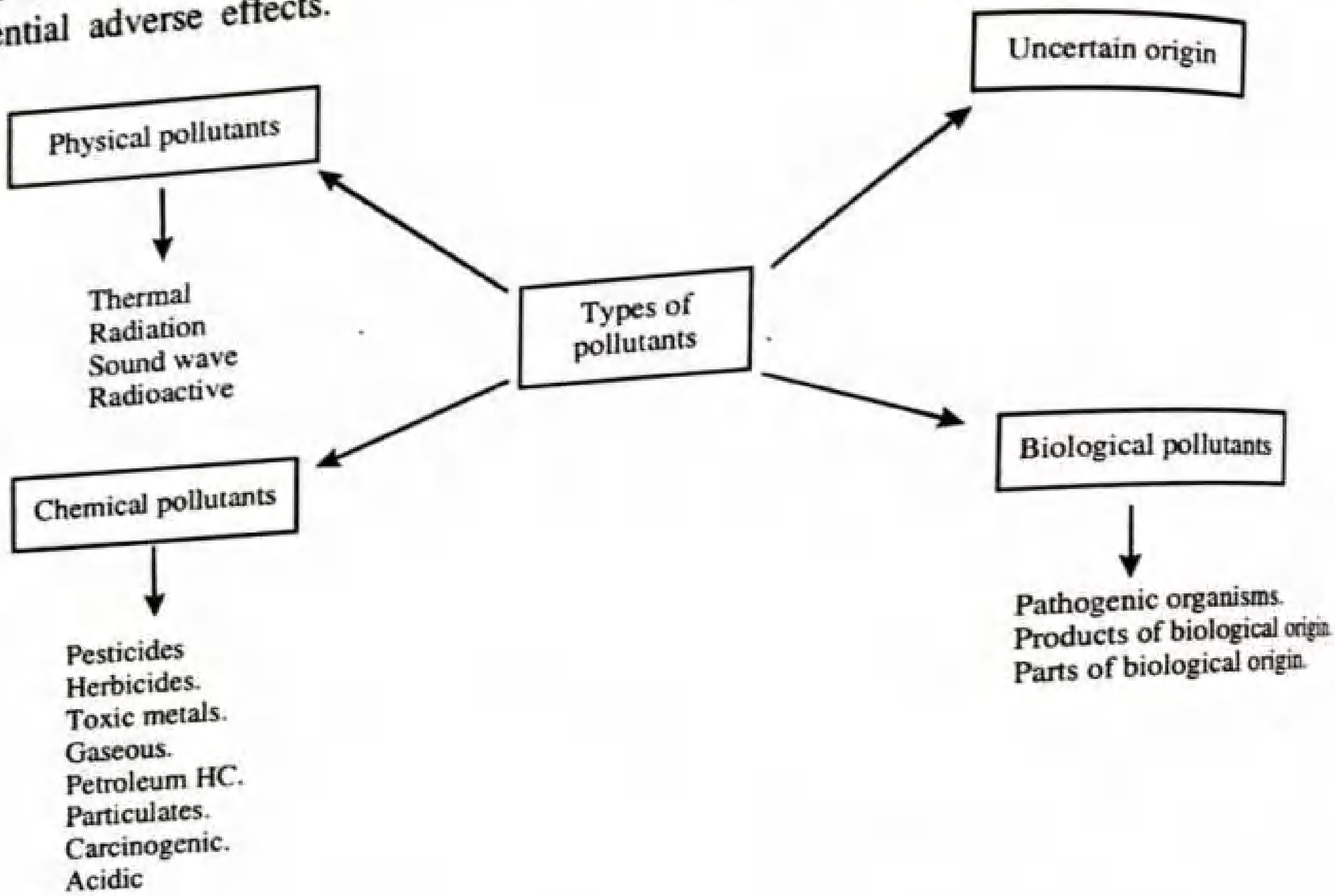

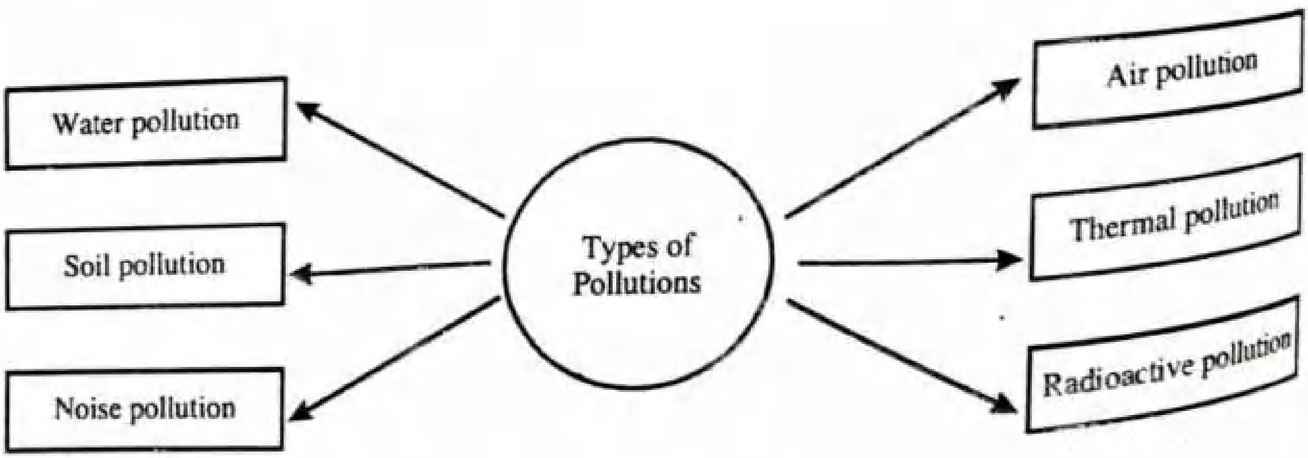

Types of pollutants and pollutions

SOIL POLLUTION

Soil pollution is defined as the introduction of substances, biological organism, or energy into the soil, resulting in a change of soil quantity, which is likely to affect the normal use of the soil or endangering public health and living environment. Soil pollution may be caused by various sources. These are - urban wastes, industrial wastes, agricultural wastes, biological agents.

AIR/ATMOSPHERIC POLLUTION

Air pollution may be defined as the presence of impurities in excessive quantity and duration to cause adverse effects on plants, animals, human beings, and materials. The air pollutants enter into the atmosphere from various natural and man-made activities such as forest fire, volcanic eruption, dust storm, rapid growth of industries and vehicles. Air pollution from automobiles, industrial plants, coals burning power plants, incinerators and furnaces have created serious environmental pollution problems.

NOISE POLLUTION

Noise pollution can be defined as any unwanted or offensive sounds that unreasonably intrude into disturb our daily lives. Noise pollution can be caused by road traffic, air traffic, rail traffic, domestic noise, industrial noise, etc.

WATER POLLUTION

Water pollution is defined s any physical, chemical, and biological, change in quantity of water that has harmful effect on living organisms or makes the water unsuitable for needs. Water pollution maybe caused by many sources.

(a) Point sources : Factory outlets, power plants outlets, underground mines, oil wells, sewage treatments plants. **(b) Non-point sources :** Urban streets, Agricultural lands, Run off, Sub-surface flow, Soil erosion, Municipal and Industrial landfill sides, Acid deposition from the atmosphere.

MARINE POLLUTION

Marine pollution is defined as introduction by a man, directly or indirectly, of substances or energy into the marine environment resulting in such destructives effects as harm to living resources, hazard to human health, and hindrance to marine activities including fishing, impairment of quality for use of sea water and reduction of amenities. According to International Maritime Organization, the different sources, air based sources, maritime transportation, dumping of wastes, offshore production.

THERMAL POLLUTION

Thermal pollution can be defined as the excessive raising or lowering of temperature above or below normal seasonal ranges in streams, lakes, or estuaries, or oceans as result of discharge of hot or cold effluents into such water. Thermal pollution major sources water as cooling agent, soil erosion, deforestation of shorelines, and run off from hot paved surfaces.

POLLUTIONS IMPACTS/ EFFECTS

Effects of air pollution: The effects of air pollution are on human health, on vegetation, on atmosphere, on animals, on materials.

Different types of responsible air pollutants and their effects on materials and vegetation in given table no. 1 & 2

Table-1 Effects of air pollutants on materials.

Effects on Materials	**Responsible Air Pollutants**
Discolouration and deterior of limestone and building materials	No_2, Co, SO_2, acids and aerosols
Reduction in tensile strength of textiles	SO_2, acid and gases
Cracking and strength loss of rubber	O_3, Oxidants
Discolouration, surface erosion and soiling of paints	Co, O_3, SO_2, H_2S and SPM
Embrittlement and discolouration of paper	SO_2 acid & gases
Corrosion, tarnishing & strength loss in metals	NO_2, SO_2, acid and gases
Disintegration and strength loss of learhter	SO_2 and acid gases

Table-2 Effects of air pollutants on vegetation

Pollutant	**Effects on Vegetation**
SO_2	Chlorosis (Disappearance of chlorophyll and Yellowing of leaves)
NO_2	Premature fall of leaves and suppressed growth of plants and reduced yield
Ozone	Necrosis (Dead areas on leaves), leaf damages and reduced yield
PAN	Premature fall of leaves, discolouraton and Epilasty (downward curvature of leaves due to higher growth rate on the upper surface).

EFFECTS ON ANIMALS

Animals take up fluorides of air through plants. Their milk production falls and their teeth and bones are affected. They are also prone to lead poisoning and paralysis.

EFFECT ON PHYSICAL PROPERTIES OF ATMOSPHERE

Some of the effects of air pollution on the physical properties of atmosphere are:

(a) Decreases in the visibility

(b) Reduction of Solar radiation

(c) Effects on weather conditions

(d) Effects on atmospheric constituents

IMPACT OF AIR POLLUTION ON HEALTH

Air pollution is a major factor in causing humans to get ill. Tuberculosis, bronchitis, heart and chest diseases, stomach disorders, asthma and cancers are caused due to chemicals present in the air. At lower doses, they can impair concentration and urobehavioral function whereas in higher doses they can cause heart pain and even death. When inhaled it has the ability to combine with hemoglobin of blood and reduce its ability in transfer of oxygen to brain, heart, and other important organs. But carboxyhemoglobin contents of blood depend on the CO contents of air inhaled, time of exposure and the activity of person inhaling. It is particularly dangerous to babies and people with heart disease. NOx may cause asthma and possibly increase susceptibility to infections. NO_2 irritates the lungs, causing bronchitis and pneumonia. Reduction in functioning of lungs and respiratory illness and breathing difficulty are the cause of inhalation of NOx. These are the substances containing only hydrogen and carbon. They are found especially in fossil fuels. Some hydrocarbon compounds are major air pollutants. Low molecular weight compounds cause eye irritation, coughing, and drowsiness. High molecular weight compounds cause mutagenic or carcinogenic problems.

The health effects of particulates are strongly linked to particle size. These inhaled particulate matters may be deposited in various regions of the respiratory system. Its region of deposition is depending on the size of particulate matter.

Generally particles of size above 10u are retained in the nose and particles of size below 10u are passing through the upper respiratory system. Particles if sizes between 0.5 to 5 u are deposited in alveoli and bronchioles and less than 0.5u size particles are deposited in alveoli.

Inhalation of the smaller particles causes lung damage, breathing problems, and triggering asthma. The smaller particles deposited in the respiratory system cannot be removed by body's natural clearance mechanisms. These smaller particulates are chemically more active and may be acidic as well and therefore more damaging.

Increased respiratory diseases, lung damage, and possibility of premature death are the effects of long term exposure of air pollutants. SO_2 affects people quickly, usually within the first few minutes of exposure. SO_2 exposure can lead to kind of acute health effects typical of particulate pollution. Exposure is linked to an increase in hospitalizations and deaths from respiratory and cardiovascular causes, especially among asthmatics and those with pre existing respiratory diseases. The severity of affects increases with rising SO2 levels, and exercise enhances the severity by increasing the volume of SO_2 inhaled and

allowing SO_2 to penetrate deeper into the respiratory tract. It is especially harmful to th with asthma, bronchits, emphysema, and cardiovascular disease. Chrysolite is the main ty of asbestos fibers causes asbestosis. The symptoms are shortness of breath, lung cancer a mesothelioma (an incurable fatal cancer).

Studies observe that the possibility of cancer is eight times higher among asbestos wo who smoke compared to that among non smoking wokers.

EFFECTS OF WATER POLLUTION

i. Presence of the many infectious agents causes many diseases. The different types

Table-3 Water Borne Diseases Vs Responsible Organisms :

Water Borne Diseases	Responsible Organism
Typhoid, Paratyphoid, Diarrhoea, Cholera, Bacillay Dtsentary	Bacterias
Amoebiasis, Giardiasis	Protozoa
Viral Hepatitis (Jaundice), Poliomyletitis	Virus
Roundworm, hookworm, threadworm	Helminths

organisms and the water borne diseases are given below in Table 3.

ii. Change in colour of water affects the usage of water and growth plants and organisms in water.

iii. The oxygen demanding wastes such as animal manure and plant residues deplete the dissolved oxygen content of water which is harmful to aquatic lives.

iv. Growth of aquatic plants and fishes are affected by the presence o acids, alkalies and toxic substances.

v. Oil and other lubricants affect the self purification of the stream or water body.

vi. The organic chemicals such as detergents, pesticides, plastics, oil and gasoline present in the water damages the CNS and causes birth defects and genetic disorders. Also these a harmful to lives of aquatic ecosystem.

vii. Enrichment of nutrients (Eutrophication from surrounding watershed affects t penetration of light through the water, causin damage to the characteristics of water a aquatic life.

viii. Dumping of solid wastes resulting surfa water as wall as ground water pollution.

ix. Disposal of coolant water used in industri increase the temperature of surface wat This affects the solubility of oxygen in wa and aquatic ecosystem.

x. More amounts of nitrates in water due the application of artificial fertilize agricultural lands can cause methemoglob emia. known as blue baby. Also it decreas

the oxygen carrying capacity of the blood in the baby.

xi. Oil spills or leaks from underground storage tanks on land are affecting a large area in a very short time. Oil spills at sea decrease the oxygen level in the sea.

xii. Run-off farms, backyards, and golf courses contain pesticides such as DDT that in turn contaminate the water.

xiii. Leachate from landfill sites is another major contaminating source. It damages the ecosystems health and reproductivity of wildlife. Groundwater is susceptible to contamination, as pesticides are mobile in the soil.

xiv. Over exploitation of groundwater results decline in water levels. Also it leads to sea water intrusion into the groundwater which deteriorates is quality.

xv. Presence of radioactive materials such as iodine, radon, cesium, uranium and thorium and its isotopes causes genetic disorder, birth defects and certain cancers.

xvi. The chlorinated organic pesticides like dieldrin, aldrin and DDT are hazardous mainly due to their concentration in food chain. They have high stability, low vapor pressure and very low solubility in water. As a result biological magnification (accumulation of concentration from one level to another level of food chain), these are harmful to the mammals in longer effects.

EFFECTS OF SOIL POLLUTION

I. Removal of the top soil of land causes low fertility for crop production.

II. Disposal of industrial effluents and domestic wastes on land causes accumulation of chemicals and loss of fertility.

III. Presence of arsenic (Ar) in the soil causes chronic poisoning which leads to loos of appetite and weight, diarrhea, gastro intestinal problems and sometimes skin cancer.

IV. Soil flora and fauna may be adversely affected.

V. The crop produced in a polluted land will be of inferior quality.

VI. Deforestation is threatening not only the existence of many species and the livelihood of many indigenous people, but can also influence the climate.

VII. Toxic chemicals leaches from land filling areas into the soil underneath causing an unusually large number of birth defects, cancers and respiratory, nervous and kidney diseases.

VIII. The disposal of cadmium from mining, metallurgy, chemical and electroplating industries cause chromic poisoning, formation of kidney stones and some times failure of kidneys.

IX. Accumulations of methyl mercury compounds are much more toxic than other forms of mercury. It causes neurological problems and damages renal glomeruli and tubules.

EFFECTS OF MARINE POLLUTION

I. Organic matter-Decomposition of organic matter present in the untreated or partially treated waste water causes depletion of dissolved oxygen content of the marine water. This can cause the death of marine plants and animals, and may lead to changes in biodiversity.

II. Eutrophication- Disposal of effluent with more nitrogen and phosphorus causes 'eutrophication' (over fertilization), which may cause algal blooms. These blooms can discolour the water, clog fish gills, or even

be toxic. Microbial breakdown of dead algae can cause deficiency of oxygen.

III. Pathogenic micro-organisms-Pathogenic microorganisms cause gastric and ear-nose-throat infection, hepatitis, and even cholera and typhoid. Eating shellfish from pollution water is a heath risk.

IV. Oil spills-Spilling of oil and oil products have complex and diverse composition and various impacts on living organisms. They affect the respiration of plants and animals. Also this causes a breakdown in thermal insulation of seabirds and mammals.

V. Toxic chemicals-Substances causing toxic-effects (e.g., heavy metals, chlorinated hydrocarbons, dioxins, and furans) that damage the physiological processes and functions of reproduction, feeding, and respiration.

VI. Pesticides-Pesticides, such as DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane), and other persistent chemicals accumulate in the fatty tissue of animals. These chemicals can cause reproductive failure in marine mammals and birds.

VII. Anti fouling paint-Ships often paint their hulls with anti-fouling paints with tributyl-tin or TBT, to prevent growth of marine organisms. These substances leach into water and effect the marine animals.

VIII. Plastics-Plastic is the dangerous solid waste. Plastic is not biodegradable and therefore affects the oceans for long periods of time. Plastics kill many marine animals. Turtles, for example, of ten swallow floating plastic bag, mistaking them for jellyfish. Animals are often strangled when they become entangled with plastic debris.

IX. Human health-Many pollutants, such as dioxins, furans, polychlorinated biphenyls (PCBs), and some heavy metals, are accumulating in the marine organisms. Wh the humans are consuming sea foods from polluted areas they are exposed to the pollutants.

X. Mutagenic-substances-Substances wi mutagenic properties (e.g., bonzo(a)pyre and other polycyclic atomic compound biphenyl, radionuclide) that cause carcinogen mutagenic, and teratogenic effects.

XI. Radioactive wastes-Any leakage or failu of radioactive wastes containers, which a used to disposed low level radioactive wast in deep sea, causes more effects that cou be devastating.

XII. Thermal pollution-Electrical generatin plants along the marine coastlines use t marine waters for cooling marine environme Thermal pollution seems to only affect t communities immediately adjacent to t discharge.

EFFCTS OF NOISE POLLUTION

The noise can affect human heath a wellbeing in a number of ways. Some of the are,

(a) Annoyance-One of the most salient effec of noise on human is annoyance. A noise said to be annoying if an exposed individu or a group of in individual would reduce t noise, avoid, or leave the noisy area possible.

Noise can cause annoyance and frustration a result of interference, interruption an distraction. Activity disturbance is regarded an important indicator of community impa of noise. Annoyance due to noise depends many factors.

Some of the main factors are.

i. Loudness of noise, ii. Frequency of nois iii. Source of noise, iv. Time of hearing (D

Night), v. Neighborhood of the area, vi. Individual characteristics of the person.

(b) **Communication Interference**-Noise pollution can have a considerable effect on communication. Noise can mask speech. Even when speech is accurately understood, background noise may result in greater pains for the talker as well as the listener. Many factors contribute to the effect of noise on communication interference.

Some of them are:

i. Frequency of noise, ii. Speech content, iii.Speech intensity, iv. Closeness of people, v. Age of people, vi. Location of the speech.

(c) **Danger to people-** Noise can cover warning singnale, causing accidents to occur and noise can hide shouts for person is in danger.

(d) **Headache-** Noise can cause increased number of headaches.

(e) **Hearing loss-** Exposure to high intensity noise for a long duration results in damage to the inner ear and thus decreases the hearing ability of a person. In addition to a general decrease in the ability to detect sounds, the quality and clarity of auditory perception can be affected, as well.

Prolonged exposure to noise levels at or above 80 Db can cause deafness. The amount of deafness depends upon the degree of exposure. Exposure to eight hours of 90 dB sounds can cause damage to ears and any exposure to 140 dB sound cause pain and immediate damage to ears.

Whether temporary or permanent, hearing loss due to noise exposure primarily affects the inner ear, especially when the noise is presented over a significant period of time.

In general, the effects of noise exposure on hearing can be divided into three categories:

.1. Acoustic trauma, 2. Noise-induced temporary threshold shift (NITTS), and 3. Noise- induced permanent threshold shift (NIPTS).

Acoustic trauma is defined as "immediate organic damage to ear from excessive sound energy". If the noise is of extremely high intensity, other structures outside the inner ear, such as the eardrum, may be affected and ruptured. Acoustic trauma often causes some degree of permanent damage to the hearing system. Both NITTS and NIPTS involve in decreasing the hearing threshold of a person. In NITTS the threshold finally returns to its original level. But in the case of NPTS the threshold shift is permanent. Thus, a person with NIPTS has no possibility of further recovery.

(f) **Heart diseases-** Noise causes stress and the body reacts with increased adrenaline, changes in heart rate, and a rise in blood pressure.

(g) **Mental depression-** Continuous exposure to high noise level can result increased mental depression rates.

(h) **Sleep disruption-** It is common knowledge that noise can disturb sleep. That is why we use alarm clocks. Noise affects the quantity and quality of sleep. When sleep is disturbed by noise, work efficiency and health may suffer. This causes increased dependence on sedatives and sleeping tablets.

EFFECT OF THERMAL POLLUTION

Thermal pollution increased the temperature of water considerably. This increase in temperature causes the following effects.

i. Change in water properties : Temperature affects physical, biological and chemical

parameters in a water body.

ii. Disturbed Ecosystem : Most aquatic organisms have adapted to survive within a range of water temperatures. Some organisms like trout and stonefly nymphs prefer cooler water, while others such as carp and dragonfly nymphs thrive under warmer conditions. As the temperature of a river or lake increases, cool water species will be replaced by warm water organisms. Few organisms can survive in temperatures of extreme heat or cool.

iii. Reduced dissolved oxygen : The addition of heat reduces the water's ability to hold dissolved gases, including the oxygen required for aquatic life. If the water temperature is greater than 95 F, the dissolved oxygen content may be too low to support some species.

iv. Increased bacterial growth : Warmer water allows bacterial populations to increase the thrive, and algae blooms may occur.

v. Photosynthesis : The rate of photosynthesis by algae and larger aquatic plants is affected by thermal pollution.

vi. Thermal shock : When a power plant opens or shuts down for repair, fish and other organisms adapted to a particular temperature range can be killed by the abrupt change in temperature. This is called as thermal shock.

vii. Increased in toxicity : The rising temperature increases toxicity of the chemicals present in water which cause massive mortality of fishes.

CONCLUTION

The spread of wide range of diseases by human activities leads to public awareness abot environment pollution.

The effects of environment pollution are so harmful and visible that even an individual at the lowest demographic levels them. This has posted a serious threat to scientists and industrialists, and they have the daunting task of providing an effective solution of pollution. They have started showing concern about the conservation of natural resources by sustainable, which would be the best solution.

REFERENCES

1. *Elements of Environment Science and Engineering, P. Meenakshi, Prentice-Hall Pvt Ltd., New Delhi, 2005*
2. *Y.N Srivastava, Environmental Pollution, Ashish Publishing House, New Delhi.*
3. *P. Anandan, R. Kumaravelan, SCITECH, Chennai & Hiderabad.*
4. *Environmental Science, Prof. S.C. Santra, New Central Book Agency (P) Ltd., Kolkata, (2001).*
5. *Environmental Science, S. Roy, Publishing Syndicate, 2003.*
6. *Environmental Studies, R. Raja Gopalon, Oxford Unisersity Press, 2005.*
7. *Environmental Science, R. C. Das, D. K. Behera, Prentice Hall Pvt. Ltd, New Delhi 2008.*
8. *Noise Pollution and Control Strategy, S. P. Singal, Narosa Publishing House, 2005*
9. *An Introduction to Air pollution, revised Edition, R. K. Trivedy, P. K. Goel, BS Publication.*
10. *Environmental Chemitry, Seventh Edition, A. K. De, New Age International (P) Limited Publishers.*
11. *A Basic Course in Environmental Studies, S. Deswal, A. Deswal, Dhanpat Rai & Co (P) Ltd. 2008.*

রবীন্দ্রনাথের উপর আলোচনা সভায় শ্রোতা ছাত্র-ছাত্রীরা।

দিশারী

বাংলা বিভাগের আলোচনা সভায় আগত অতিথি বক্তা ড. শিবব্রত চট্টোপাধ্যায়, ড. তপন গোস্বামী, অধ্যক্ষ ড. নুরুল হুদা এবং বাংলা বিভাগের প্রধান ড. চৈতন্য বিশ্বাসের সঙ্গে অন্য কয়েকজন।

রক্তদান শিবিরে রক্ত দিচ্ছেন ড. চৈতন্য বিশ্বাস।

দিশারী

বৃক্ষরোপন কর্মসূচীতে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক দেবব্রত সাহা চারা পুঁতছেন। পাশে রয়েছেন অন্যান্য অধ্যাপক ও ছাত্ররা।

Sallekhana: A distinctive type of Voluntary Death

Debabrata Saha
Asstt. Professor of philosophy
Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

Death plays a central role in the philosophies and religions of India, the issues involved in assessing death in its various forms are highly detailed and often complicated. As the modern debate over the ethical standing of euthanasia continues, much can be learned from an examination of histories of Jainism, Buddhism, and Hinduism as they relate to voluntary death.

In Jainism a form of voluntary death is found among the jaina ascetics. This type of death is distinctive and different form voluntary and non voluntary euthanasia well known to modern western ethical thinkers. This type of death is noted as sallekhana in Jaina ethics.

Sallekhana is facing death by an ascetic or a layman voluntarily when he through sever penance has completed the enjoyment of entire fruits of karma and after subjugation of all passions and abandonment of all attachment has come to the end of his life but for some reasons or other, it is not possible for him to continue normal life. It must be stressed that the vow of *Sallekhana* as propounded by Jainism is in no way can be called suicide. Psychologically it is just an intention of saying good-by to the old body which fails to work properly and inviting a kind of passionless death.

The vow of *Sallekhana* has psychological, religious and spiritual significance. From the psychological point of view an individual have to fight against the feeling of grief, fear, anguish etc. it is vow to be adopted for seeking liberation of the soul from the body as a religious duty. The basic concept underlying the vow is that man, who is the master of own destiny, should face death on such a way so that it can prevent the flux of new karmas that can bind him further.

The Jainas and the Buddhists face numerous difficulties in accommodating such a form of death in their ethical structure. Each school, however, deals with the issue differently. My intention is this paper is to expose the nature of such a form of voluntary death practiced in Jaina and Bauddha tradition.

In Indian tradition the jainas were the first to accept and legitimize the practice of a type of self-willed death approved by the religion. Such self-willed death in Jainism is one kind of self-starvation. This practice was believed to be a way of finishing one's life only after finishing the accredited results of karma as well as removing the remaining *karmas* after an individual had been ascetically purified. The practice was originally performed under constraints by monks and nuns who had undergone extensive preparatory purification. The monastic individual could attain proper knowledge through years of meditation. At the fag end of life he preferred to adopt such a practice to avoid premature or bad death.[1] Radhakrishnan states that it was commonly believed that after twelve years of ascetic preparation nirvana was assured and the individual may kill himself in a prescribed manner.[2]

Later on, *Sallekhana* was allowed for laity as well as monks and nuns. But such practice had been regulated cautiously and carefully, and continued to be so. A lay person seeking *Sallekhana* had to obtain forgiveness, discuss

all sin with a guru, and make a formal vow of intention. The individual was then required to focus on scripture while meditating on the nature of the self; during this time of meditation and reflection the individual would gradually abstain from food and water. Right before death, the individual would repeat the *mantranamokar* wit the aid of a monk or nun. This process was eventually viewed as the ideal death for a Jain.[3]

In early Buddhism a type of voluntary death continued to be adopted. It is, however, absolutely different from the practice adopted among the Jains. Some early Buddhist monks committed suicide or sought the assistance of a knife-wider to put an end to his life. After experiencing the foulness and impurity of the body accompanied by a feeling of being better of dead the early Buddhist monks decided to get rid off present body either by him or by the assistance of others. Buddha, however, was dead-against of such practice. After coming to know the practice of such incidents, Buddha forbad both such practice of the destruction of human life and the act of a knife-wider in assisting other's death.[4] In the Patimokkha, the Theraveda code for monastic discipline, Buddha says, "A monk who preaches suicide, who tells a man: 'Do away with this wretched life, full of suffering and sin; death is better,' in fact preaches murder, is a murderer, is no longer a monk".[5]

In early Buddhist tradition the historians noted three cases of self-willed death; one of Vakkali, one of a Channa, and one of Godhika, which were condoned by Buddha. Those deaths happened to occur due to the selfless, desire less, and enlightened states of their minds. In these exceptional circumstances, those three monks had achieved arhatva (enlightenment) after their death and were not reborn; because they had transcended conventional morality.[6] Unlike the Jains, self starvation was only permissible means for the Buddhists to get rid of the bonda body. Such types of deaths were permitted under three circumstances: 1) cases where was no time to collect food while meditatin in cases of severe prolonged illness wh monk chooses to die so as not to trouble caregivers, and 3) incase of intense illness w a person knows he has reached the de meditative state.[7] In later Buddhist ethics, who is in a state of beyond attachment and all regards for life, is found to have the abil to end his life. These individuals were call *dhira* or strong ones.[8] Another sect of Buddhis the servastivada, accepted voluntary death order of avoid the loss of enlightenment. Th idea behind the practice was that once a individual reaches a state of enlightenment, ther exists the chance that they could fall back into confusion and lose their state of enlightenmen if they carried out their human life. Instead of taking risk of such a loss, an enlightened person was allowed to commit suicide.[9]

In the history of the Brahmanical tradition several forms of voluntary death, were often religiously motivated and were accepted at various points of time such as *mahaprasthana* *samadhaimarana*, *prayopavesan* etc. *Mahaprasthana* was the act of setting out in on the great journey toward death by wandering through the wilderness until the individual died of starvation, exhaustion, etc. *Samadhaimarana* was death that occurred while one was meditating. *Prayopavesan* is equivalent to the Jain practice of *sallekhana*, or self-starvation.[10] self-starvation was acceptable in cases of terminally ill patients. It was thought that such voluntary death promoted detachment, purified the sprit, and ensured that there would be no signs of bad death (urine, feces, vomit).[11] All such cases of self-willed death became illegal with arrival of British law under the Indian Penal

code.[12] Another form of acceptable voluntary death was the practice of *sati*. When a women's husband died, it was considered dharmic for her to follow her husband into death by throwing herself on his funeral pier. For a long time this was considered a very virtous death for all Hindu women, and was not considered suicidal because it should not have been motivated by a woman's desire to escape the plight of widowhood. The act of *sati* was believed to secure heaven immediately for both the woman and her husband.[13] *Sati* was made illegal in 1829 when it was declared culpable homicide.[14]

The voluntary or so-called self-willed death faces incompatibility with the code of ahimsa prevailed in different religions. The central in the ethics of the Jainas, the Buddhists and the Hindus is the ideology of *ahimsa*. *Ahimsa* can be defined as positive kindness to all creation[15], respect for life, abstaining from causing injury or death to any living thing[16], or more generally, non-violence. The Jains in particular hold *ahimsa* as a central piller of their ethic. Some even wear a shroud over their mouths in order to prevent the accidental inhalation of a living small insects. The ethical code of *ahimsa* is thus apparently opposes *sallekhana*.

The Jains, however, see no contradiction between ahimsa and sallekhana. The reason is that *Sallekhana* is a peaceful mode of death carried out in a religious context by advanced religious practitioners. A liberated person is virtually beyond opposition of life and death. Even when the practice was extended to laity, voluntary death was highly regulated and required the involvement of a monk or nun, Sallekhana is in no way be called an act of himsa. The less activity one participates in, the less likely one is to bring harm to other living creatures. In theory, an individual acquires *karma*, or negative matter attached to the self, as one participates in day-to-day activity. Even the act of accidentally stepping on a bug whould bring with it *karma*. One way to completely avoid bringing harm to any living creature would be to cease activity completely, including eating and drinking. A devout Jain would gradually ceases all activities including eating and drinking, with nonviolence as his motivation.

Based on the acceptability of and arguments for *sallekhana*, passive euthanasia, involving the withdrawal of medical treatment may claim moral acceptability. *Sallekhana* is acceptable because it happens to occur after one being enlightened after the enjoyment of all fruits of karmas is over which has no place in case of so-called passive euthanasia. Active euthanasia is more violent, more rigorous and more dissimilar to the practice of sallekhana in its nonviolent and passive nature. Active euthanasia requires a doctor to administer lethal drugs to a patient, leading to the patient's death. In such a case the doctor is directly bringing harm and death to another living creature. This active administration of lethal drugs to a patient would probably be interpreted as violent because it causes the death of a person violating the idea of *ahimsa*.

In the Jain tradition, the act of *sallekhana* allows individuals to withdraw from the activities of daily life and die a peaceful death, a death motivated by the central ethical idea of *ahimsa*. The active euthanasia is not only difficult but impossible to defend from a Jain perspective. The passive euthanasia also seems to face no better fate. No form of euthanasia is ethically acceptable by citing the practices of sllekhana by the Jains. For the classical Buddhists, the self-willed death was complicated by the ideas of *samkalpa* (intention) and compassion. Although Buddha spoke firmly against the taking of one's own life, or the aid of

taking another's life, he still demonstrated great compassion in cases where someone was fatally ill and in great pain. He also seemed to make exceptions for those who had already achieved an enlightened state of mind and whose motivation for death was not selfish. Still euthanasia, either active or passive, could not be ethically acceptable by the classical Buddhists. In classical Hinduism, the cases *sati* where the intention of a wife to burn herself alive with the dead body of her husband was influenced by more religious custom and blind faith than any ethicl code or consideration. Only that much can ben claimed that some form of self-willed death under certain circumstances was accommodated in each of the above tradition's ethical and moral code.

REFERENCES

1. *Coward, Harold G., Lipner, Julius, and Young, Katherine K. Hindu Ethics : Purity, Abortion, and Euthanasia, p.88.*
2. *Radhakrishnan, S. Indian Philosophy Vol. 1, p.327.*
3. *Coward, Harold G., Lipner, Julius, and Young, Katherine K. Hindu Ethics : Puriy, abortion and Euthanasia, p.107.*
4. *Keown, Damien. Buddhist Ethics : A Very Short Introduction, p.401.*
5. *Coward, Harold G., Lipner, Julius, and Young, Katherine K. Hindu Ethics : Puriy, abortion and Euthanasia, p.89.*
6. *Keown, Damien. Buddhist Ethics : A Very Short Introduction, p.106.*
7. *Harvey, Peter. "A Response to Damien Keown's Suicide, Assisted Suicide, and Euthanasia : A Buddhist Perspective." p.411.*
8. *Coward, Harold G., Lipner, Julius, and Young, Katherine K. Hindu Ethics : Puriy, abortion and Euthanasia, p.104.*
9. *Keown, Damien. Buddhist Ethics : A Very Short Introduction, pp.106-107.*
10. *Coward, Harold G., Lipner, Julius, and Young, Katherine K. Hindu Ethics : Puriy, abortion and Euthanasia, pp.79-85.*
11. *Firth, Shirley. "End-of-Life : A Hindu View." The Lancet, p.682.*
12. *Coward, Harold G., Lipner, Julius, and Young, Katherine K. Hindu Ethics : Puriy, abortion and Euthanasia, p.76.*
13. *Coward, Harold G., Lipner, Julius, and Young, Katherine K. Hindu Ethics : Puriy, abortion and Euthanasia, pp.111-112.*
14. *Mani, Lata. "Contentious Traditions : The Debate on Sati in Colonial India." Cultural Critique, p.119.*
15. *Radhakrishnan, S. Indian Philosophy Vol. 1, p.325.*
16. *Keown, Damien. Buddhist Ethics : A Very Short Introduction, pp.106-107.*

BIBLIOGRAPHY

1. *Radhakrishnan, Indian Philosophy, Vol. 1, New York, The Macmillan Co., London : George Allen & Unwin Ltd., 1st publication 1923.*
2. *Samsookha, Puranchand, Essence of Jainism, Jain Bhawam, 3rd Edition 1999.*
3. *Tattavartha Sutra That which Is, Trans. By Tatia, Nathmal, Motilal Banarsidass, 1st Indian Edition, Delhi, 2007.*
4. *Hiriyanna, M., Outlines of Indian Philosophy, George Allen & Unwin Ltd., London, 1968, 1st publication 1932.*
5. *Coward, Harold G., Hindu Ethics, state university of New York press. Albany, NY. 1989.*
6. *Mani, Lata, "Contentious Traditions : The Debate on sati in colonial", University of Minnesota press, 1987, cultural critique.*

Construction of Widowhood in Late 19th-Century Early 20th Century Bengali Fiction

Suddhasattwa Banerjee
Asst. Professor in English
... Bhakat College, Nalhati, Birbhum

...he Hindu Widow Remarriage Act being ... on 26th July 1856 and the first such ...iage taking sixteen long years to make ... fictional debut in Bankim Chandra ...padhyay's *Bishabriksha*, which started to ...serialized in *Bangadarshan* in April 1872. ...der issues can be traced as intrinsic to the ...izing process and concomitantly indigenos ...ructions of gender in colonized countries ...gaged under colonialism. Indian nationalists ...ce of necessity to address gender questions ...n general while challenging Colonialism in ...rious phases of the movement for Widow Remarriage. Depiction of Kundanandini ...ated a series of powerful young widow ...acters in the works of the three masters of Bengali novels of the period, specified for my ...dy, namely Rabindranath and Sarat Chandra ...o follow Bankim.

Position of widows at intersections of ...tested space in a colonial situation of domination and subordination from mid 19th Century to mid 20th Century Bengal is my prime focus in this study of a few novels consisting powerful young widow characters belonging to the specified period. Their female - ness and sexuality were elements that were debated and constructed by men, both colonizers and colonized, to fit their varied needs. I will also try to dwell, though in a more limited way on a concern related to such work, namely that widows were regarded as objects and portrayed either as victims or passive beings in processes of male agency. The conventional focus on the legacies of colonialism and nationalism, particularly on their constructions of women with respect to tradition, as well as female sexuality can be demonstrated by the creation of an idyllic "golden age" for the portrayal of women in the Vedic era (c. 1500 - 600 BC) was a response by Indian men to the colonial critique of the subordinate status of Indian women, ironically derived from the orientalist works of Europeans of the late 18th century.

The women's question had been the focal point of very controversial reform debates for most of the nineteenth century in Bengal and it includes the debate concerning Hind Widow Remarriage Act 1856. A number of social reformers tried to address this issue. Rammohan Roy initiated this movement in the 1820s, as did Derozio and the Young Bengal group in the 1830's. The Indian Law Commission (1837) considered the issue seriously and concluded that infanticide could be curbed only if Widow Remarriage was legalized. However, the government took the position that, even though such a law was socially desirable, passing it would involve going against Hindu strictures and laws of inheritance and hence infeasible. There were scattered attempts to legalize Window Remarriage in the 1840s as well. Ishwar Chandra Vidyasagar took up the issue in the 1850s and led it to an apparent success. The middle - class Bengali 'Bhadralok' community fuelled and fanned these debates to accept dichotomized lifestyle distinction, i.e., home/world, spiritual/material, feminine/ masculine. While these opposites afforded

recognition for difference with equality, in reality they worked to strengthen traditional gender divisions to the disadvantage of the widows.

The articulations of widow characters in the specified time and space always tended to reinforce patriarchal traditions, as well all too apparent for example, in the social reform movement in Bengal in the nineteenth century. The tendencies here illustrated quite clearly how for male reformers, femaleness emanated from fulfilment of traditional roles of wife and mother within social systems under male control. Unsurprisingly, all the major players in these constructions of women were male. Women were debated, discussed, acted on and constructed by men with very little input from women themselves. The women's question had been the focal point of very controversial reform debates for most of the nineteenth century in Bengal. However, it disappeared as a result a "resolution" of sorts when the middle-classes which had fuelled and fanned these debates appeared to accept dichotomized lifestyle distinctions, i.e., home/world, spirital/material, feminine/masculine. While these opposites afforded recognition for difference with equality, in reality they worked to strengthen traditional gender divisions to the disadvantage of women. Thus, in essence what occured was the promotion and preservation of separate spheres.

Despite much opposition from conservative sections, the Hindu Widow Remarriage Act was passed on 26th July 1856, permitting Widow Remarriage to be performed in the same way as a rst marriage. It was a permission law : modalities such as the registration procedure were left quite unaddressed. The Act had two provisions. First, Widow Remarriage would be legally valid and the o spring would be legal. Second, the widow would forfeit all claims to wealth and nancial support inherited through earlier marriages. The first Widow Remarriage took place on 7th December 1856 in Calcutta. Quite a few Widow Remarriages occured in 1857. However, overall, the movement was a failure. The Bengal Census of 1881 reported about 50,000 Hindu widows in the 0-14 age bracket, about 93,000 in the 15-19 group, and about 3,76,000 in the 20-29 category. Only about 80 widows were remarried in Bengal over a span of 30 years (between the years 1856 and 1886, published in the newspapers of that time), and only about 500 remarriages had taken place by 1889.

Contrary to current articlations of feminist theory, in which agency is synonymous with resistance, the upper caste, middle class Bengali widow characters in late 19th Century and early 20th Century Bengali fiction exercises agency by which I mean self-realization, through a performance of devotion or *sattvic* to a man other than her deceased husband. This act of devotion is replete with her unfulfilled sexual desires, and is also modelled sacred practices of devotion drawn from Hindu devotional practices. I would like to attempt to open up feminist modes of inquiry to include the sacred as a system of knowledge that can productively inform our understanding of gendered agency through a close reading of late nineteenth-century Bengali fiction.

Bhadralok society revered the married woman as the *kulalakshmi* or goddes lakshmi of the household or can, and rejected the widow because she had lost her husband and was thus *alakshi* or unlucky. While the conjugal bond anchored the widow to her marital home, she lost all her rights with in the moment her husband ceased to exist. Due to the practice of marrying young girls to older men, a large number of widows

young women in their reproductive prime, lived in their decreased husband's home, within an extended family, where they upon conjugal relationships, but could in any themselves. Although the *Widow* *Marriage Act XV* OF 1856 allowed a widow remarry, this was taboo in *bhadralok* society, thus a large number of widows were either on the funeral pyre or left to live an impoverished life in their marital homes.

The figure of the nineenth-century *bhadralok* Bengali wife and her counterpart the *bhadralok* has been the subject of much scholary debate. In his book, *The Nation and its Fragments*, Partha Chatterjee argues that *bhadralok* women were the properties of an asexual spirituality; a woman who defied this norm was considered Westernized and 'would invite the ascription of all that the 'normal' woman (mother/sister/wife/daughter) is not-brazen, avaricious, irreligious, sexually, promiscuous'. In equating "good" Indian femininity with an asexual spirituality, Chatterjee excludes the possibility of sexual fermininity that is a part of Hindu *bhdralok* society, rather than a Westernzed otherness. Feminists have rightly contested Chatterjee's theorization of the *bhadralok* wife as a mere, asexual token of nationalist discourse, and suggested that the *bhadralok* women was capable of autonony and interiority. The nationalist and colonialist emphasis on upper-caste, middle-class women excluded lower-caste, poor, Muslim women : This image foregrounded the Aryan woman (the progenitor of the upper-caste women) as the only object of historical concern. Meanwhhile] the Vedic dasi (the woman in servitude), captured, subjugated, and enslaved by the conquering Aryans, but who also represents one aspect of Indian womanhood, disappeared without leaving any trace of herself in nineteeth century history...[The] Aryan woman came to occupy the center of the stage in the recounting of the wonder that was India" (Uma Chakravarti's "Whatever Happened to the Vedic Dasi").

Similarly, other feminist work has also emphasized the way in which the figure of the widow was co-opted by imperialist and nationalist discourse. Lata Mani's ground-breaking work on the colonial discourse of *sati* or widow immolation brings to the fore the production of the widow as an object of colonial strategies for power, while Tanika Sarkar's *Hindu Wife, Hindu Nation* suggests that the figure of the widow was used similarly by nationalists as a symbol of the pristine, spiritual essence of India. Building upon the work of these feminist theorists, in this paper, I suggest that the widow becomes the subject of the narrative of her life only in late-nineteenth-early twentieth century Bengali domestic fiction, written by made *bhadralok* writers who used the novel form to put forward their social critique of orthodox Hindu society. In her chaper, "Sarkar focuses on the figure of the Hindu widow, who remains unaccounted for in Chatterjee's theorization of the nation. She argues that the widow enables the construction of a pure spiritual sphere because "[S]trict ritual observances root [her] body in ancient India, thus miraculously enabling her to escape foreign domination. The cloth she wears is necessarily indigenous, the water she dimks is to be carried from the sacred river and not through foreign water pipes...Ergo, the nation needs ascetic widowhood". Sarkar's theorization of the nation, then, foregrounds the widow's spirituality, thus separating her further from the outer sphere of materiality, which Sarkar signifies as "foreign domination." Her insistence on the widow's "asceticism" excludes the possibility of her

sexuality, the desires of her body, its materiality. Once again, the widow is relegated to the "ancient," and the traditional; she is outside modernity, even as she lives within it.

The first novel to deal exclusively with this issue was Bankimchandra Chatterjee's Bisha briksha [The Poison Tree] (1873), which was soon followed by *Krishnakanter Uil* [Krishnakanta's Will] (1978); in both novels, widow protagonistsfall in love with married men and eventually destroy the men and their households. The widow's illicit love for a man other than her deceased husband was a concern that persisted in the Bengali literary imagination because a few years later, Rabindranath Tagore reworked Bankimchandra's plot in his novel *Chokher Bali [a Grain of Sand inthe Eye]* (1902), and Saratchandra Chatterjee reworked both novels in *Charitraheen* [The Characterless One] (1913) and *Srikanta* (1917-1934). All three novelists were involved in varying degrees with the nationalist struggle, and thus they were all concerned with the "women's question" in different ways. As a staunch Hindu, Bankimchandra was primarily concerned with the way that the widow was reconfiguring the traditional structure of Hindu society. On the other hand, as a reformer deeply invested in women's right. Saratchandra suggested that Hindu, caste society was to blame for the injustices perpetrated on the widow.

These debates occured in local journals and newspapers, as well as in fiction. The serial publication of novels in reputed lierarary journals such as *Jamuna, Bharatbarsha* and *Prabashi,* edited by famous luminaries such as Rabindranath Tagore and Dwijendranath Roy, made them the subject of series consideration for the *bhadralok* reading public, who voiced their concerns and ofter compelled the authorto reconsider the plot of his story. For instance, Sarat Chandra's *Charitraheen*, a novel that de[als] with a widowed maid-servant's love for h[er] master, provoked moral outrage in the readi[ng] public who could not stomach the thought of [a] maid-servant much less a widowed maid-serva[nt] falling in love with her master.

In a letter to his friend and editor Pramath[a] Sarat Chandra writes: 'I'm not bothered abo[ut] my name, people may think whatever they abo[ut] me....and whether it [*Charitraheen*] is immor[al] or moral people will read it eagerly....Phoni [th[e] editor of *Jamuna*] has written that people awa[it] my stories eagerly. Let it be! "Time" alone wi[ll] judge me for people make good decisions ar[e] bad decisions. To worry about their opinions [is] a mistake' (S. Chatterjee "Letter to Pramath[a]" 38-39). Despite his disavowal of public opinio[n] Saratchandra was compelled to change th[e] unseemly conclusion of *Charitraheen* becau[se] of social pressure. Thus, it is evident that fictio[n] was an important medium for the disseminatio[n] of ideas and an agent of social change.

In this context of an evolving nationali[st] discourse centred on the figure of the widow fiction provided an alternative means throug[h] which writers could explore the figure of th[e] widow. In what follows, I read the afore mentioned novels as offerning alternat[ive] trajectories for the widow's life. Through a clos[e] reading of these novels, I argue that the wido[w] character of late-nineteenth century *bhadral[ok]* fiction performs *sativa* or devotion in an attem[pt] to gain conjugality, domesticity and in som[e] cases salvation for herself. Nineteenth-centu[ry] *bhadralok* society privileged a particlar Hin[du] notion of devotion or *satitva,* which various[ly] means chastity/devotion, and was a term use[d] specificially for the good wife's undyin[g] devotion to her husband.

Within the context of *bhadralok* society, th[e]

nbodied *satitva* or wifely devotion to gain rough service to her god-like husband. the wife became a widow she was ed to renounce all the *bhadralok* signs ininity, such as coloured saris, jewellery ng hair. Perhaps the most significant sign wife's adherence fo *bhadralok* norms of inity is her asexual *satitva*, her devotion husband, which will be her salvation and hich she is revered as a *kulalakshmi*. fore, the wife's ultimate act of *sativa* is elf-immolation on her husband's funeral thus, the widow's very existence suggests she has failed in the *satitva* to her husband.

Vithin this socio-historical context, the w character's embodiment of *sativa* is a radiction in terms; it cannot exist because object of her *sativta* haspassed away, yet it ts. I argue that in an attempt to resolve the stion of the widow's place within *bhadralok* iety, the novelists created the widow as the able of the wife. Thus, while the wife resented an asexual *satitva*, the widow was r sexually aware counterpart. However, cause the widow is not the *kulalakshmi*, her abitation of *sativa* is necessarily different om the *kulalakshmi's* asexual *satitva*. I argue at widow replaces the *kulalakshmi's* asexual *titva* with a *sativa* that is sexual and spiritual the same time. In making this argument, I ome up against Dipesh Chakrabarty's eorization of the widow character of *bhadralok* iction as emblodying primarily an asexual *atitva*.

Dipesh Chakrabarty sees the spiritual and the exual a binary oppositions. Therefore for Chakrabarty, the widow's *satitva* is characterized by *pabitrata* or purity and not sexuality. He argues that while the post-Enlightenment European subject possesses interiority and autonomy, the widow, as a product of an indigenous modernith, is characterized by *pabitraata* rather than sexuality. However, I argue that what differentiates these widow characters from the European post-Enlightenment subject is not their inhabitation of a Westernized modernity, but their performance of sexual desire which is interwined with a longing-- not for autonomy (like the European subject)-- but for sexual *and* spiritual subjugation by the lord.

In making this argument, I build upon the theoretical framework of agency articulated by Saba Mahmood in her anthropological work on women's participation in the Mosque movement in Cairo. Mahmood argues that in the context of Islamic Egypt, women realize themselves by acquiescing to the norms of Islam which necessitate submission to patriarchal authority, and thus, 'what may appear to be a case of deplorable passivity and docility from a progressivist point of view, may actually be a form of agency---but one that can be understood only from within the discourses and structures of subordination that create the conditions of its enactment'. The word Islam means submission, and thus the "discourses and structures of subordination" are intrinsic to leading a virtuous Islamic life.

Drawing upon Mahmood's work, I suggest that a similar system of submission underlies Hindu practices of devotion, especially as they were articulated in Bengal. Bengali Hinduism was largely characterized by the particular strand of Vaishnavism promulgated by Chaitanya Mahaprabhu, a sixteenth-century saint, who believed that Lord Krishna could be achieved through intense loving devotion, which entailed a complete submission of the self to Krishna's will. This form of worship was known a *bhakti* or devotion and became a central feature of Bengali Hinduism. Within the context of late-

nineteenth century Bengal, this Hindu system of devotion had been formalized into the exclusive worship of Lord Krishna, over and above other Hindu gods. However, the radicalism of Chaitanya Mahaprabhu's doctrine of living.

In her essay on the itinerant saint Mirabai, Kumkum Sangari suggests that *bhakti* was an inherently feminized form of worship, and was especially apparent in its Bengali manifestation. "The 'feminisation' of worship is more pronounced in Vaishnav texts. This tendency was later foregrounded by Bengal Vaishnavism wherein "The essential nature of all men is that of *gopi* [cowgirl] in the Bhagwat Purana, one of the relations it is possible to have with Krishna, among others, is that of a love as the *gopis* do".

Chaitanya Mahaprabhu's vision of *bhakti* was popularized in the late late-nineteenth century by Bijoy Krishna Goswami. He was an ardent worshipper of Krishna, who became associated with Rammohan Roy's Brahmo Samaj, but eventually withdrew from it to revive Krishna worship in the tradition of Chaitanya Mahaprabhu : "Bijoy's [Krishna Goswami] partial disillusionment with the [Brahmo] Samaj led him to study the *Chaitanya Caritamrita*, a biography of the great *bhakti* saint, under the guidence of Harimohun Pramanil. Bijoy visited various Vaishnava *gurus* but did not break with the Samaj. Instead in 1869 he returned to his work as a Brahmo missionary, yet Bijoy increasingly blended devotional Vaishnavism as taught by Chaitanya with his own concept of Brahmosim...in 1899 he finally broke completely with the Brahmo movement and began his career as a spokesman of revived Vaishnavism" devotion had been subsumed by the overly ritualistic practices of Brahamanic Hinduism, in which men were the rightful worshippers of god, while women could hope only to reach god by worshipping their godlike husbands.

The widow's desire for subjugation, then, stems from a larger discourse of devotion as subjugation. More specifically, I suggest that the widow's devotion is modelled on that of another window, Mirabi, a fifteen-centuy itinerant saint, who repudiated her lawful husband and considered Krishna her lord. The figure of Mirabai was popularized by Chaitaya Mahaprabhu in Bengal and Mira's ecstatic worship of Krishna was taken to be paradigmatic of the true *bhakta's* worship of god. This form of Krishna *bhakti* popularized by Mirabai gained currency in Bengal and at the turn of the nineteenth century it was customary for Bengali women who had been abandoned by society, such as widows, to follow Mirabai's example and become *Vaishnavis* or devotees of Krishna. However, the priests of the temple, upon whose goodwill these destitute women depended, often misused their power and compelled them to become prostitutes. Therefore, the term *Vaishnavi* came to be synonymous with a "loose woman" and consequently, the term for prostitute in Bengali and Hindustani was *baishya* or *vaishya*, a modification of *Vaishnavi*.

The Bengali intelligentisia was very concerned with the liminal status of these women, who were once respectable *kulalakshmis* but had now been driven to prostitution. Bankimchandra condemned the sect of *Vaishnavis* because it was separated "by a very slight line from the utter negation of female morality which constitutes prostitution" (Sen 86). Saratchandra on the other hand drew sympathetic portraits of these unfortunate women in his fiction. In *Srikanta*, Kamal Lata, a minor character, is a widow who has become a *Vaishnavi*, and is the epitome of selfless

devotion, but is charged with immorality because of her association with the sect of Vaishnavas. It is evident then, that the widow characters of these Bengali novels aredrawn from the larger cultural context in which widows became Vaishnavis, and thus their devotion has the same sexual-spiritual tendor as Mirabai's devotion :

> Though Mira appears in some ways of life, her bhajans [devotional songs] are filled with sensuous yearing...In a sense it is the female, voice with its material basis in patriarchal subjugation which provides the emotional force of self abasement and willed servitude....The sensuos symbolism and performative mode transgree the austere conventions of upper caste widowhood, but what occurs at the same time is that her songs re-evolve a new relation of bondage which is now replete ith desire (Sangari 1472).

The term *satitva* comes from *Sati*, the mythological goddess who was married to the Lord Siva. Legend has it that *Sati's* father. Lord Daksha invited all his daughers and their husbands to a great holy sacrifice, but neglected to invite his daughter *Sati* and her husband Siva because he was embarrassed of his son-in-law's hermetic appearance and unpredictable behaviour. When *Sati* learnt of the sacrifice she went to her father's palace and threw herself into the holy sacrificial fire because her father had insulted her husband. The term *sati* then, came to be synonymous with the good woman, and by extension the good woman was the one who would fulfill her duty by her husband by willingly immolating herself on his funeral pyre, and thus the term *satitva* came to connote devotion both conjugal and spiritual to one's husband whether alive or deceased.

It is temting to read the widow's desire for *satitva* as an act of rebellion, and therefore of feminist agency, in keeping with the discourse of liberal humanism, in which agency is synonymous with rebellion. However, this a peculiar rebellion, if it indeed is a rebellion because through this "rebellion," the widow fefies on set of norms (of ascetic widowhood) in favour of another set of norms (of sexual and spiritual subjugation) in the hope of limiting her freedom.

Freud defines the unhomely as that 'which is familiar and old-established in the mind and which has become alienated from it only through the process of repression' (Freud 224). He discusses the unhomely in the context of a psychoanalytic reading of Hoffman's 'The Sandman,' where he suggests that Nathaniel's childhood castration complex reveals itself in adulthood as the fear of having his eyes plucked out, and the manifestation of this fear is the unhomely. While Freud used his understanding of the unhomely for the purpose of psychoanalysis, Homi Bhabha adopts the notion of the unhomely in the colonial context. Bhabha suggests that the colonized subject's condition of unhomeliness arises from the "deep historical displacement" (Bhabha 451) caused by colonial categories of differentiation (such as race), which alienate her from herself, and cause her to experience the "insider's outsideness." I contend that this displacement from the self, this experience of the 'insider's outsideness' arises not from the racist idelogy of the colonial state, but from the patriarchal norms of *bhadralok* society, which decree asexual asceticism for the widow.

In other words, the widow's *satitva* is illegitimate because she is a widow. Therefore, in the novels, the widow's performance of *satita* is at odds with the *bhadralok* home because in these novels the home is metonymic for the nation. In heranalysis of the construction of

women in imperialist and nationalist discourse. Inderpal Grewal extends Chatterjee's argument to suggest that "Indian woman's location in the women's part of the house becomes the symbol of what is cacred and private for Indian nationalist culture" (Grewal 54). If the home is the repository of nationalist culture, and nationalist culture makes no space for the sexual-spiritual *sativta* of the widow, then similarly, there is no space for the widow's *sativa* within the *bhadralok* home. In the novels, both the widow and her lover are compelled to leave the *bhadralok* home and set up a home elsewhere. The second home, then, becomes anexternalization of the widow's interiority, of her sexual-spiritual *satita*, and thus another site of the unhomely. The second, illegitimate home cannot be housed within nationalist discourse of its extension, the *bhadralok* novel, and hence the narrative usually ends with the destruction of both manifestations of the unhomely; the second home and the widow. *Bhadralok* society's refusal to make space for the widow or the second home ultimately leads to its own destruction as the widow's enactment of her sexual-spiritual *satita* destabilizes its very foundations.

Both the widows Savitri and Kiranmayi are deprived of sexual pleasures throughout their lives. However, Savitri remains chaste and prizes her sexual purity more than the unalloyed love of Satish. She is not prepared to encounter the consequent social condemnation if she gives way to her fervour. In contrast, Kiranmayi gives way to her passions at every opportunity but outshines all other women in terms of her unique personality and individuality. Binodini is a contrast through her autonomy and her refusal to be bent and subjugated by daunting patriachal customs for widows. She understands very clearly that being a widow she would have to strive for her own survival and self-dependence.

Silent suffering of young widows, their suppressed instincts and feelings were vividly and realistically painted by Sarat Chandra. They sprang from his deep experience of social life which was hide-bound by tritions. They were as inhuman as they were considered immutable. He made the mute pathetic creatures speak out their suppressed feelings with the strength of creative art, sensitive and compassionate mind, his photographic transcription of life and its comprehensive understanding and innate, uncommon sensibility. The gallery of remarkable, realistic, poignantly appealing portraits which he painted of these women is the highest accomplishment to the credit of his art of novel-writing. They resulted from the direct and intimate experience of the society where he lived. They highly valje chastity, devotion reverence for elders, absoulute obedience to parents and older members of the family. They accept their destinies calmly and gracefully. The sometimes rebel against ignoble practices but never denounce the traditions as a whole. As a result, his narratives were centred in the thoughts, joys, heartbreaks and the day-to-day lives of ordinary people. His realistic fiction was almost unprecedented and beckoned many followers to imitate his literary trend. (Guha vii) Thus, Saratchandra's widow characters enable us to explore many facets of a woman's personality under diverse circumstances.

In *Charitrahin* and *Srikanta*, Sarat Chandra projects several widows as 'fallen women', yet depicts their room as a patch of purity amidst an abject atmosphere of general squalor. It might be read as the purity of their virtue and integrity despite the adversity which they encounter. In *Charitrahin*, Satish respectfully removes his shoes before entering Savitri's room in the

servant's tenement, which is otherwise inhabited by women of dubious reputation. The presence of books neatly arranged and the paraphernalia of worship reveals to Satish her high caste and refined tastes. Similarly Rajlakshmi's room in her manson in Patna in simple, tidy and contains minimum furniture in contrast to the lavish style of the rest of the house. Kamallata's room is cosy, austere and inviting although the remaining *akhra* is mean and wretched.

Both the widows Savitri and Kiranmayi are deprived of sexual pleasures throughout their lives. However, Savitri remains chaste and prizes her sexal purity more than the unalloyed love of Satish. She is not prepared to encounter the consequent social condemnation if she gives way to her fervour. In contrast, Kiranmayi gives way to her passions at every opportunity but outshines all other women in terms of her unique personality and individuality. All the widows are expected to be sexless and abstain from embellishments and any from of material indulgence. This can be clearly seen through characters like Savitri, Annapurna, Rajlakshmi (*Chokher Bali*), Jagattarini, Yogamaya, Binodini and Bara Rani.

Binodini (*Chokher Bali*) had been educated by an English tutor. Tagore visualised that the impact of weastern education, if used judiciously, would immensely assist the progress of the nation. Sarojini in Sarat's *Charitrahin* also adheres to western culture. She holds her English education in high esteem. Tagore's Binodini reads Bankim's novel *Bishabriksha,* a story of a wodow who ruins a household and thereby reads what she would not do as a widow. It shows how Indian women becme the consumers of the new identity for women. These are the seeds of the new woman cast through the characters studied in this paper. Keeping in mind these feminist reflections it may be derived that a 'Novum Femme' was being envolved by Bankim Chandra, Sarat Chandra and Tagore combining eclectically the positive aspects of the women characters in their fiction. It is the contemporary perception of woman's status that gives these women their uniquencess. They boldly exhibit their firm resistance to the tyranny that patriarchay inflicts on them. Confidence, determination, candour, creativity self-dependence and sincerity are some of the positive traits that may be distilled from these characters to create a kind of a woman who may not exist as a character in the works discussed so far, but may aid in building-up the image of a new woman who could become the role-model of the present-day society and the generations to come.

Roles like that of a widow is thoroughly insecure both in society and in familiy. Some of the most significant heroines who are widows, among the novels of Bankim, are Kunda in *Vishavriksha* and Rohini in *Krishnakanter Uil.* Bimala in *Durgeshnandini* who avenges her husband Mahendra's death is perhaps the most valorous of all the widows. Savitri, Kiranmayi, Binodini and Kamallata belong to the younger generation of widows who face contempt and severe oppression from the society. On the other hand, Bara Rani (*GhareBaire),* Rajlakshmi (*ChokherBali)* and Aghormayi belong to the older generation of widows who inflicttorture and agony on younger widows because the former group may have been treated in a similar manner. All the younger widows have been projected as reserving their affections for a particular man. Savitri does this for Satish, Kiranmayi for Upendra, Kamallata for Gahar and Binodini for both Mahendra and Bihari. The authors indicate that the older widows like Bara Rani and Rajlakshmi hesitantly violate the customs while

the younger widows like Savitri and Kiranmayi transgress overtly. They tacitly call attention to the urgency of reforming the plight of widows. Being throttled by sereve constraints from the society, they rebel by being able to enchant the men. but for the cause of their social responsibility they abandon their desire of materializing their alliance with them. These authors retreat to the portrayal of widows within the decorum of existing anti-widow/anti-humane norms as considered acceptable by the contemporary.

Annapurna stands apart from all other widows as a conformist of the norms but she is not incognizant of the malpractices that are prevalent in the society. She is a foil to Bara Rani who chews betel leaves and gossips with an obnoxious company of women she keeps around her. Other widows like Maheshwari, Upendra's sister and Jyotish's mother do not receive significant mention in the novel. Savitri and Kiranmayi have been presented as foils in the novel *Charitrahin.* Savitri is a widow while Kiranmayi is a married woman who later becomes a widow. Both have unquenched physical desires. Savitri offers her pure and undiluted love to Satish withot expecting anything in return while Kiranmayi's love is largely centred in physical desires alone. Hence, Savitri turns Satish away while Upendra turns Kiranmayi away because her love is denounced as involving shallow sentiments and filthy desires. Kiranmayi tried to seduce Upendra bt failed beacause he was judicious, calm and not fickle. By the sheer force of the large number of widows in their works, most of whom are young , the authors under study wish to draw the attention of their readers to the appalling situation for women. This signifies the vast inequality of the marriageable age during marriage. It is a gross malpractive where women have no say.

It may be noted that almost all the widows portrayed in the other novels reserve an eye for economic and social dependence upon a certain man--normally the son or a brother-in-law as in the cases of Bara Rani, Harimati De (Devdas' mother), Rajlakshmi, Aghormayi, Kiranmayi, Jagattarini and so on with exceptions to Savitri, Yogamaya and Kamallta. This dependence makes them overprotective about some man or the other. Both Tagore and Sarat Chandra have projected a certain possessiveness among widows as represented by Bara Rani (*Ghare-Baire),* and Kiranmayi (*Charitrahin*). Being the wife his older brother Bara Rani has been Nikhil's playmate in childhood. However this tender tie becomes stronger soon after she gets widowd and she depends upon him for familial and finaccial support. She perceives Bimala as an impediment in her relationship with Nikhil and thus she treats her with bitterness and hostility. Kiranmayi plays a similar game with Divakar when she is spurned by Upendra. She elopes with the former and seduces him. Thus both Bara Rani and Kiranmayi attempt to grab possession of men who are nither husbands nor their lovers. That economic dependence renders all women (more so, the young widows) as portable objects for all kinds of exploitation is a strong point-of-view held by these authors through their creative works.

The theme of fallen and transgressing widows in any Indian social novel must be comprehended in the cultural context of the late nineteenth and early twentieth centuries, when under the impact of Christian missionaries, the freedom movement and movements of social reform, vigorous attempts were being made in the society to educate middle class Indians to purge the society of its malpractices, redefine moral values and question existing gender

relations. However, their radical measures were tempered by their fear of disrupting the patriarchal caste-bound structures of the society which gave the upper-caste Hindus a distinctive edge. The glorification of women cast out from the mainstream society reflected the bipolarity of liberal Indian writers, who on one hand romanticized their situation, and on the other, set impossible standars of chastity and self-denial for them. Their sexuality was acknowledged but not accorded propriety which enforced and enhanced their suppression and further exploitation. Econômic requirements drove widows like Chandramukhi and Rajlakshmi into prostitution. Yet, idealized and romanticized protagonists of fiction who were widows have been shown to refuse material rewards for their sextual favours. Despite their autonomy and fervour, they are depicted as victims of the same patriarchy which oppressed respectable women within the institution of marriage and denied them their individuality.

Tanika Sarkar's *Hindu Wife, Hindu Nation* suggests that the figure of the widow was used similarly by nationalists as a symbol of the pristine, spiritual essence of India. In her chaper, "Hind wife, Hindu Nation : Domesticity and Nationalism in Nineteenth Century Bengal," Sarkar focuses on the figure of the Hindu widow, who remains unaccounted for in Chatterjee's theorization of the nation. In his book, *The Nation and its Fragments,* Partha Chatterjee argues that *bhadralok* women were the repositories of an asexual spirituality; a woman who defied this norm was considered Westernized and 'would invite the ascription of all that the 'normal' woman (mother/sister/wife/daughter) is not--brazen, avaricious, irreligious, sexually promiscuous'. Sarkar argues that the widow enables the construction of a pure spiritual sphere because "[S]trict ritual observances root [her] body in ancient India, thus miraculously enabling her to escape foreign domination. The cloth she wears is necessarily indigenous, the water she dirnks is to be carried from the sacred river and not through foreign water pipes...Ergo, the nation needs ascetic widowhood". Sarkar's theorization of the nation, then, foregrounds the widow's spirituality, thus separating her further from the outer sphere of materiality, which Sarkar signifies as "foreign domination." Her insistence on the widow's "asceticism" excludes the possibility of her sexuality, the desires of her body, its materiality. Once again, the widow is relegated to the "ancient," and the traditional; she is outside modernity, even as she lives within it. All three novelists were involved in varying degrees with the nationalist struggle, and thus they were all concerned with the "women's question" in different ways. As a staunch Hindu, Bankimchandra was primarily concerned with the way that the widow was reconfiguring the traditional structure of Hindu society. On the other hand, as a reformer deeply invested in women's right, Saratchandra suggested that Hindu, caste society was to blame for the injustices perpetrated on the widow.

In her study of the widow character, Susie Tharu writes "It could be argued, and I am going to do so, that when a writer features a widow as protagonist he or she is, consciously or unconsciously, making an intervention in a debate centred on this figure....Widow stories therefore are invariably also subtly modulated historical engagements with questions of governmentality and citizenship." Following this, I too suggest that the widow character of Bengal fiction of late 19th Century and early 20th Century must be read as the *bhadralok* mediation between the private sphere of *bhadralok* social and moral codes and the public sphere of colonial law.

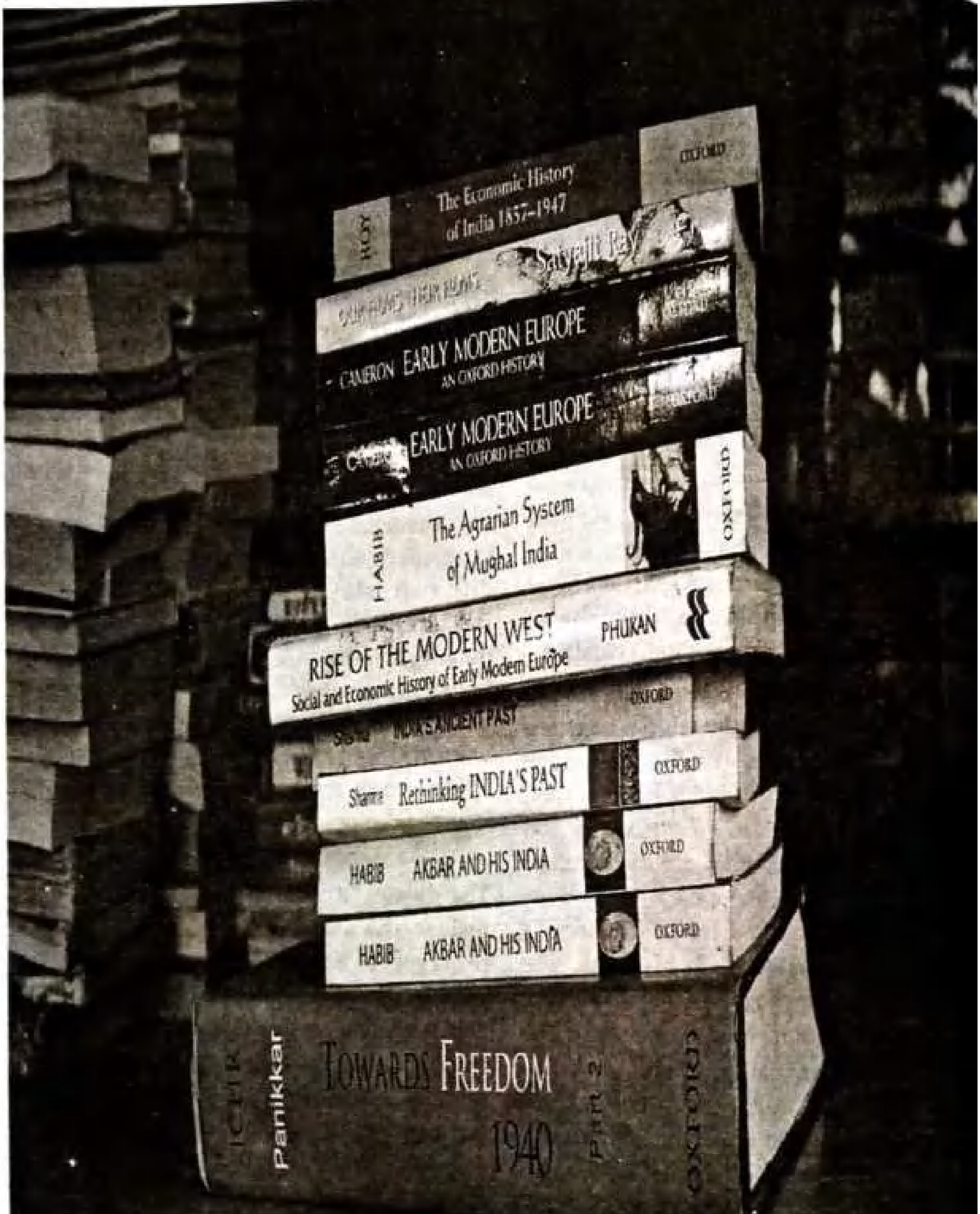
The Economic History of India 1857–1947
ROY
OXFORD
Satyajit Ray
CAMERON EARLY MODERN EUROPE
AN OXFORD HISTORY
EARLY MODERN EUROPE
AN OXFORD HISTORY
HABIB The Agrarian System of Mughal India
OXFORD
RISE OF THE MODERN WEST
Social and Economic History of Early Modern Europe
PHUKAN
INDIA'S ANCIENT PAST
OXFORD
Sharma Rethinking INDIA'S PAST
OXFORD
HABIB AKBAR AND HIS INDIA
OXFORD
HABIB AKBAR AND HIS INDIA
OXFORD
ICHR Panikkar TOWARDS FREEDOM 1940
OXFORD

অধ্যক্ষ ড. নুরুল হুদার বিদায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পরিচালন সমিতির সভাপতি বিপ্লব কুমার ওঝা।

দিশারী

অধ্যক্ষ ড. নুরুল হুদাকে বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে মানপত্র দিয়ে ড. হুদাকে সম্মান জানাচ্ছেন সভাপতি বিপ্লব ওঝা ও ড. চৈতন্য বিশ্বাস।

BONUS

পনেরোই আগস্ট, ২০১৫, জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর কলেজের সভাপতি,
ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকসহ অন্যান্য অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মীগণ।

দিশারী

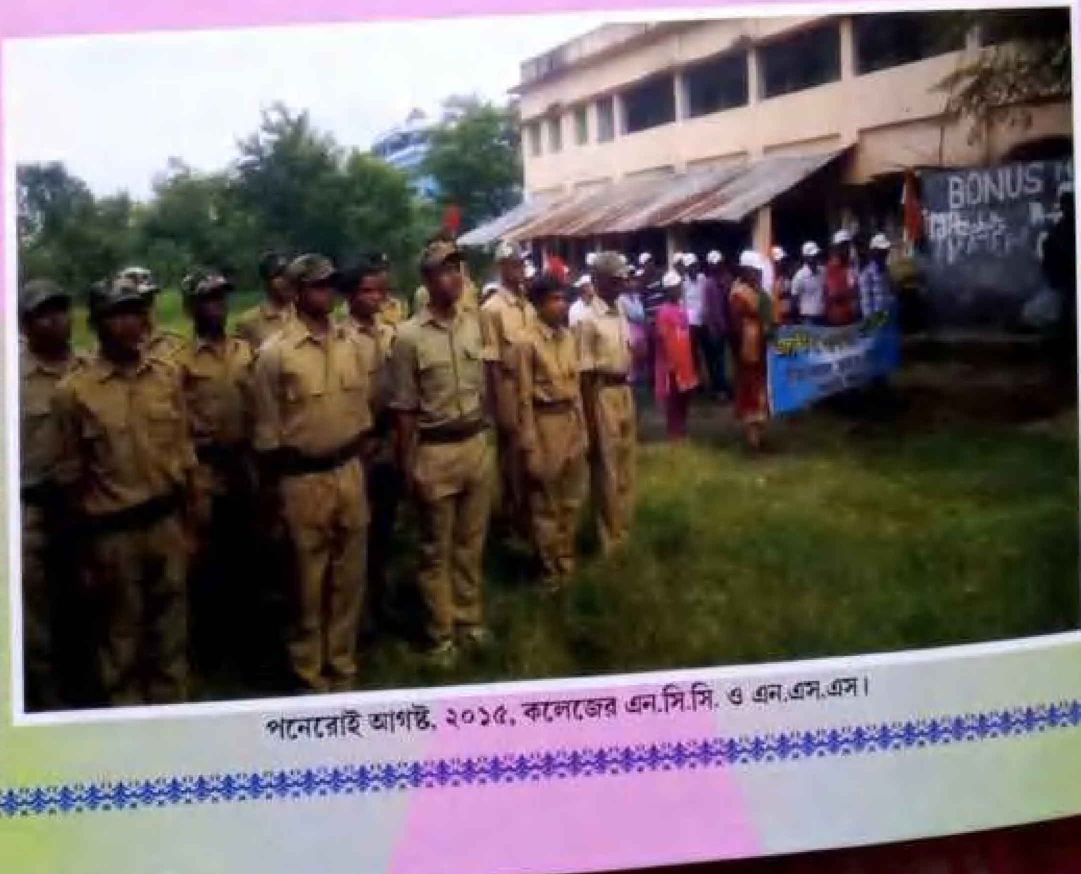

পনেরোই আগস্ট, ২০১৫, কলেজের এন.সি.সি. ও এন.এস.এস।